তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি

যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

রচনায় ঃ
যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
বান্দরবান উজান পাড়া,
বান্দরবান।

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৭শে মে, ১৯৮৫ ইংরেজী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা
বান্দরবান উজান পাড়া
বান্দরবান।

মুদ্রণে ঃ শান্তি প্রেস
৪১, কাটাপাহাড় লেইন,
টেরীবাজার, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ ১২.৫০ টাকা।

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা রসিক নাগর তঞ্চঙ্গ্যা

ও

স্বর্গীয়া মাতা সুরমালা তঞ্চঙ্গ্যা
এর পুণ্য স্মৃতিতে-

- লেখক

বইটি কেন লেখলাম

বাংলাদেশের বৃহত্তর পার্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত পাহাড়ী উপজাতি বসবাস করে তন্মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি একটা। এরা মূলত চাকমাদের একটা অংশ হলেও কারো কারো মতে চাকমাদের অনুসারী পৃথক এক সম্প্রদায়ের পাহাড়ী উপজাতি মাত্র। এ সম্পর্কে স্বনামধন্য জনাব আবদুস সাত্তার মহোদয় তাঁর 'আরণ্য জনপদে'র ১২০ পৃষ্ঠায় কর্ণেল ফেইরীর একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ 'চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা বা দৈংনাকেরা ভিন্ন জাতি। দৈংনাকেরা নিজেদেরকে 'সিম্' বা 'নাগো' নামে পরিচয় দেয়। খুব সম্ভব তারা বাঙ্গালী সংমিশ্রণের সন্তান-সন্ততি। দীর্ঘদিন আরাকানীদের সান্নিধ্যে থাকায় এবং আবহাওয়ায় ক্রম বিবর্তনে তাদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়।'

তিনি উক্ত পুস্তকের ১২১ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণের পর রাজা বিজয়গিরি আর স্বদেশ না যাইয়া সখ্যভাবে আরাকান রাজের সহিত আরাকানেই অবস্থান করেন। এই সময়ে তংচঙ্গীয়াগণ অর্থাৎ আরাকানের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাকমাদের অনুকরণে কথাবার্তা কহিতে শিখিলেও চাকমাগণ তাহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত বলিয়া লয় নাই। এমন কি বিবাহাদি কার্যেও কোনরূপ ইহাদের সহিত সম্বন্ধ নাই। চাকমাগণ সাধারণত ইহাদিগকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, তঞ্চঙ্গ্যারা নিজেদেরকে 'সিম্' বা 'নাগো' নামে কোন দিন পরিচয় দেয়নি, এখনও দেয়না এবং এদের মধ্যে যে ১২টা গছা বা দল আছে, এদের মধ্যেও কথাবার্তা, স্ত্রীলোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি-নীতি এমন কি বিবাহাদি ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে অমিল আছে। সুতরাং চাকমাদের সাথেও তঞ্চঙ্গ্যাদের মিল নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা যে এককালে একই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এই কথাও অস্বীকার করা চলে না। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উহাই প্রতিভাত করতে প্রয়াস পেয়েছি।

জাতিগতভাবে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্পর্ক এতই গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে মূলত একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার কথা লেখতে গেলে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তাই তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি সম্পর্কে লেখতে গিয়ে বাধ্য হয়েই চাকমাদের কথা কিঞ্চিৎ না লিখে পারা গেল না।

এই যাবত তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পর্কে কোন বই স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয়নি; কেবল চাকমাদের ইতিবৃত্ত লেখতে গিয়ে তঞ্চঙ্গ্যাদের কথা যৎসামান্যই বর্ণিত হয়েছে মাত্র। তাও লেখকের অনুমানের উপর ভিত্তি করে অথবা অনেকটা দায়ছাড়া ভাবেই লিখিত হয়েছিল। তাই এই পঞ্চাশোর্ধ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে 'তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকটি লিখে আমার তথা তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতির ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তঞ্চঙ্গ্যা নামের একটা ঠিকানা রেখে যেতে প্রয়াস পেলাম।

মাত্র চল্লিশ বৎসর পূর্বেও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে কিরূপ রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল তা আজ আমাদের ছেলে-মেয়েরা জানেনা। সুতরাং এদের ছেলে-মেয়েরা আমার বর্ণিত বিবরণগুলো এক প্রকার কল্পিত কাহিনী বলেই মনে করবে। ভবিষ্যত বংশধরেরা নিজেদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও জানুক, তাই এই পুস্তক লেখার প্রয়াস। উৎকট টি.বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে আজ মরি কি কাল মরি অবস্থায় পুস্তকটি প্রকাশ করতে গিয়ে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লেখার কাজে আমার দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী প্রীতিকণা তঞ্চঙ্গ্যা যে অনলস পরিশ্রম করেছে তজ্জন্য তাকে কেবল আন্তরিক শুভাশীষ জ্ঞাপন ব্যতীত আমার আর কিছু দেবার নাই।

বইটিতে অনেক ত্রুটি থাকবে, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সুধীজন সমাজে আমি মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি এবং পরিশেষে এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁদের পুস্তক-প্রবন্ধাদির সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ রইলেম। ইতি-

২৭ শে মে, ৮৫ ইংরেজী
বান্দরবান উজান পাড়া

বিনীত-

যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র চাকমাকৃত

শ্রীশ্রীরাজনামা বা চাকমা রাজন্যবর্গ’ পুস্তিকার বিবরণ মতে

সূর্যবংশ ও চাকমা রাজবংশের তালিকা

১। ব্রহ্মা	২৭। সম্ভত	৫৩। ঋতু পর্ণ
২। মরিচী	২৮। অন রস্য	৫৪। সর্ব কাম
৩। কাশ্যপ মুনি	২৯। পৃষ দশ্ব	৫৫। সুদাম
৪। সূর্য	৩০। হর্যাশ্ব	৫৬। সৌদাম
৫। বৈশ্যত মুনি	৩১। সুমনা	৫৭। অশ্মক
৬। ইক্ষাকু	৩২। বিধন্বা	৫৮। মূলক
৭। বিকুক্ষি	৩৩। এর্যরুন	৫৯। দশরথ
৮। দণ্ড ও শাকুণি	৩৪। সত্যব্রত	৬০। হিলবিল
৯। পুরঞ্জয়	৩৫। মহারাজ ত্রিশঙ্কু	৬১। বিশ্বসহ
১০। অনেনা	৩৬। অরিজিত	৬২। মহারাজ অট্রাঙ্গ
১১। পৃথু	৩৭। হরিশ্চন্দ্র	৬৩। দীর্ঘ বাহু
১২। বিশ্বতাশ্ব	৩৮। রোহিতাশ্ব	৬৪। রঘুদেব হতে রঘুবংশ
১৩। আদ্র	৩৯। চঞ্চু	৬৫। প্রবুদ্ধ
১৪। শ্রাবস্ত	৪০। বিজয়	৬৬। সংখন
১৫। বৃহদাশ্ব	৪১। রুরুক	৬৭। সুদর্শন
১৬। কুবলাশ্ব	৪২। বৃক	৬৮। শীগ্রঘ
১৭। দৃড়াশ্ব	৪৩। বাহু	৬৯। মরু
১৮। বার্যাশ্ব	৪৪। মহারাজা সাগর	৭০। অরু
১৯। নিকুম্ভ	৪৫। অসমঞ্জ	৭১। পশুশ্রুত
২০। সিংহতাশ্ব	৪৬। অংশুমান	৭২। অম্বরীষ
২১। কৃপাশ্ব	৪৭। মহারাজা দিলীপ	৭৩। নহুষ
২২। প্রসেনজিত	৪৮। ভগীরথ	৭৪। যযাতি
২৩। যুবনাশ্ব	৪৯। সুত	৭৫। নাভাগ
২৪। মান্ধাতা	৫০। অম্বরীষ	৭৬। অজ
২৫। পুরু কুৎসু	৫১। সিন্ধদীপ	৭৭। দশরথ
২৬। এস দুস্য	৫২। অযুতাশ্ব	৭৮। রাম

৭৯। কুশ	১১০। বৃহদ্বল (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত)	১৩৮। ময়ুখ
৮০। অতিথি		১৩৯। ক্ষেমকেতু
৮১। নিরদ	১১১। বৃহৎ কর্ণ	১৪০। ছত্রধ্বজ
৮২। নল	১১২। উরু ক্ষয়	১৪১। অভিরথ (তাঁর পর অনেক রাজা রাজত্ব করার পর)
৮৩। নভঃ	১১৩। বংস	
৮৪। পুণ্ডরীক	১১৪। উৎব্যুহ	
৮৫। ক্ষেত্রধরা	১১৫। প্রতিব্যুহ	১৪৬। ওপূর
৮৬। দেবারীক	১১৬। বৃহদশ্ব	১৪৭। নিপুর
৮৭। অহিন্গু	১১৭। ভানু রথ	১৪৮। কল্প কণ্ডক
৮৮। রূপ	১১৮। প্রমিত	১৪৯। উল্কামুখ
৮৯। রুরু	১১৯। সুপ্রতিক	১৫০। হস্তীক
৯০। পারিপাত্র	১২০। অহদেব	১৫১। সিংহহনু
৯১। বজ্রনাভ	১২১। স্বনক্ষত্র	১৫২। শুদ্ধোদন
৯২। শঙ্খনাভ	১২২। কিন্নর	১৫৩। সিদ্ধার্থ বা গৌতম (শাক্যগণের কোন বংশানু ক্রমিক রাজা ছিলেন না)
৯৩। বিশ্বসহ	১২৩। সুবর্ণ	
৯৪। হিরন্যাভ	১২৪। সুমিত	
৯৫। বীর্যতাশ্ব	১২৫। বৃহদ্রাজ	১৫৪। সুধন্য
৯৬। হিরন্ময়	১২৬। ধার্মিক	১৫৫। লাঙ্গলধন
৯৭। পৃশ্য	১২৭। কৃতঞ্জয়	১৫৬। ক্ষাত্রজিত
৯৮। সুদর্শন	১২৮। রণসিন্ধু	১৫৭। সমুদ্রজিত (ইতি নিঃসন্তান)
১০০। মহা সুদর্শন	১২৯। অরঞ্জিত	
১০১। অগ্নি বর্ণ	১৩০। পুরঞ্জিত (শাক্যবংশ)	১৫৮। শ্যামল (ঐ মন্ত্রী)
১০২। শীগ্রঘ		১৫৯। চম্পক কলি (চম্পক নগরের প্রতিষ্ঠাতা)
১০৩। মরুক	১৩১। রঞ্জিত	
১০৪। অরুক	১৩২। করণ্ডক	১৬০। সাদেংগ্রী
১০৫। প্রথুশ্রুত	১৩৩। জ্বলামুখ	১৬১। চৈঙ্গ্যাসুর
১০৬। সুগন্ধি	১৩৪। হস্তীমুখ	১৬২। চম্পাসুর
১০৭। অমর্শ	১৩৫। বৃহদ্ভানু	১৬৩। সুমেসুর
১০৮। মহা শ্বান	১৩৬। অনুরথ	১৬৪। ভীমঞ্জয়
১০৯। বিশ্রুতবান	১৩৭। ভীমবাহু	১৬৫। সাংবুদ্ধা

১৬৬। বিজয়গিরি (গেংগুলিদের গীতে জানা যায়, উদয়গিরির পুত্র বিজয়গিরি) রাজনামা মতে সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি ও উদয়গিরি। বিজয়গিরি ৫৯৫ খৃঃ অক্সাদেশ জয় করেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর পর রাজা হলেন জামাতা।	১৮৬। অরিন্দম ১৮৭। জ্ঞানানু ১৮৮। শ্বেতব্রত ১৮৯। সাকালিয়া (জনৈক রাজবংশীয়) ১৯০। বাঙ্গাল্যা সর্দার (ঐ জামাতা) ১৯১। সাদালীয়া ১৯২। রামা থংজা ১৯৩। কমল চেগে ১৯৪। রতন গিরি	হয়েই চাকমা জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। ২০৭। ধাবানার পুত্র মঙ্গল্যা ২০৮। ফতে খাঁ ২০৯। সেরমস্ত খাঁ ২১০। শুকদেব (ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ওর মস্ত খাঁর ২১১। সের দৌলত খাঁ (তাঁর আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইংরাজের অধীনে চলে যায়
১৬৭। সিরিত্তমা	১৯৫। কালা থংজা	২১২। জান বক্শ খাঁ
১৬৮। শরণ নামা	১৯৬। চক্রধর	২১৩। তব্বর খাঁ
১৬৯। উলত্তমা	১৯৭। ফেল্যা ধাবেং	২১৪। ধরম বক্শ খাঁ
১৭০। জনু	১৯৮। সের মত্যা	২১৫। হরিশ্চন্দ্র (ঐ কন্যা চিকনবি এবং গোপীনাথ দেওয়ানের পুত্র)
১৭১। কমল জনু	১৯৯। অরুন যুগ	
১৭২। উচ্চংগিরি	২০০। শত্রুজিত	
১৭৩। মইসাগিরি	২০১। মৈসাং রাজা (মংছুই)	২১৬। ভুবন মোহন রায়
১৭৪। কমল যুগ		২১৭। নলিনাক্ষ রায়
১৭৫। মদন যুগ	২০২। তৈন সুরেশ্বরী	২১৮। ত্রিদিব রায়
১৭৬। জীবন যুগ	২০৩। জনু	২১৯। দেবাশীষ রায় (ইনি ৫৪তম চাকমা রাজা)
১৭৭। রতন গিরি	২০৪। বুড়া বড়ুয়া (ঐ জামাতা)	
১৭৮। ধন গিরি		
১৭৯। সন্ন গিরি	২০৫। সাত্তুয়া বড়ুয়া (পাগালা রাজা)	
১৮০। বুদ্ধাংগিরি		
১৮১। ধর্ম্মজিত	২০৬। ধাবানা (সাত্তুয়ার কন্যা অমঙ্গলীর পুত্র) ইনি আগরতলার জনৈক অমাত্য মুলিমা থংজার পুত্র। ধাবানা রাজা	
১৮২। মনোরথ		
১৮৩। অরিজিত		
১৮৪। মৈনাংশা		
১৮৫। কেবল		

নির্দেশিকা

১। তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি	১
২। অবস্থান	৮
৩। জনসংখ্যা	৯
৪। জুম চাষ	৯
৫। সেকাল আর এ'কাল	১১
৬। খেলাধুলা	১৩
৭। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ পদ্ধতি	১৫
৮। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহে বৈধ ও অবৈধ	১৯
৯। বিবিধ	২০
১০। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা	২২
১১। জন্ম	২৩
১২। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শবদাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি	২৫
১৩। ভাত-দ্যা	২৭
১৪। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	২৮
১৫। বাদ্যযন্ত্র	৩২
১৬। একটি লাঙ্যা-লাঙনী গীত্	৩৪
১৭। চাকমারা শাক্য বংশীয়	৩৬
১৮। ভাষা	৩৮
১৯। গণনা	৪০
২০। বা-না (ধাঁ-ধাঁ)	৪১
২১। তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যাঁরা স্মরণযোগ্য	৪২
২২। লেখক পরিচিতি	৪৪
২৩। লেখকের কথা	৪৪

তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল, জেলা- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। অত্রাঞ্চলের নয়ন-মন জুড়ানো স্নিগ্ধ সবুজ বনানী পরিবৃতা অসংখ্য সর্পিল ঢেউ খেলানো পাহাড়-পর্বত সমাকীর্ণ উচ্চভূমি, তারই মাঝে মাঝে পাহাড়ীয়া ছোট ছোট নদী আর ঝিরিগুলো নীরব চঞ্চলতায় অবিরাম গতিতে প্রবহমান। প্রকৃতির এ'হেন অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন বাংলার পূর্ব্ব দিগন্তস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে আপন আপন সংস্কৃতি বজায় রেখে বসবাস করছে বিভিন্ন গোত্রের পাহাড়ী উপজাতি; তন্মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি একটা। এদেরকে চাক্‌মাদের একটা অংশ বলা হলেও, কারো কারো মতে এরা চাক্‌মাদের অনুসারী পৃথক একটা সম্প্রদায়ের পাহাড়ী উপজাতি মাত্র।

স্বর্গত মাধবচন্দ্র চাক্‌মা তাঁর "শ্রীশ্রীরাজনামা বা চাক্‌মা রাজন্যবর্গ" নামক পুস্তকে চাক্‌মারা দুটো অংশে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছিলেন। উক্ত দুটো অংশের মধ্যে একটা "রোয়াঙ্গ্যা চাক্‌মা" বা টংচঈঙ্গ্যা চাক্‌মা এবং অপরটা "আনক্যা চাক্‌মা"। একদা আরাকানকে বলা হতো রোয়াঙ্গ আর চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোকে বলা হতো 'আনক'। চাক্‌মাদের মধ্যে যাঁরা রোয়াঙ্গ-এ বসবাস করতেন তাঁদের বলা হয়েছিলো রোয়াঙ্গ্যা চাক্‌মা আর আনক্‌-এ যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের বলা হয়েছিলো আনক্যা চাকমা। স্বর্গত মাধবচন্দ্র চাকমার উক্তিতে আমরা অন্ততঃ এই ধারণাটুকু পাই।

এখন আমি চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই- "শ্রীশ্রীরাজনামা বা চাকমা রাজন্যবর্গ" অথবা "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তকদ্বয়ে বর্ণিত চম্পক নগরের প্রাচীন চাকমা রাজা সাদেংগ্রীর পরবর্তী ৬ষ্ঠ পুরুষ বিজকগ্রী সম্ভবতঃ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন অক্সাদেশ (পরবর্তীকালে রোয়াঙ্গ এবং বর্তমানে আরাকান) জয় করতঃ তদীয় অনুগত স্বজাতি প্রজাবৃন্দ (মতান্তরে সৈন্যগণ) সহ প্রথমে "সাঃ প্রেঃ" নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে তদ্দেশের

বিজাতীয়া রমণী বিবাহ করেন এবং তাঁর অনুগত স্বজাতি প্রজাদিগকেও বিজাতীয়া রমণী বিবাহ করার অনুমতি দিয়ে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

লক্ষণীয় যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অনেকেই অদ্যাবধি "সাঃ প্রেঃ কুল্যা" অর্থাৎ 'সা প্রে'র বাসিন্দা বলে পরিচিত। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে মংগলা গছা, মেলংগছা, লাংগছার লোকেরা যে গীত গায়, তাকে 'সাপ্রে গীত' বলা হয়। আরাকানীদের ভাষায় চাকমাদেরকে বলা হয় 'সাক' এবং স্থান বা ভূমিকে বলা হয় 'প্রেঃ'। সুতরাং 'সাক প্রেঃ' অর্থে চাক্‌মাদের বাসভূমিকে বুঝায়।

বিজকগ্রীর পর আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত চাক্‌মা রাজা রাজত্ব করেছিলেন তন্মধ্যে মইসাগিরি ছিলেন সপ্তম। রাজা মইসাগিরির রাজত্বকালে ত্রিপুরার মহারাজা চম্পকনগর (কালাবাঘা রাজ্য সহ) অধিকার করে নিলে চম্পকনগর ও মইসাগিরির চাকমাদের গমনাগমন রহিত হয়ে যায়। সুতরাং এ থেকেও ধারণা করা যায় যে চাকমাগণ চম্পক নগরে ও মইসাগিরিতে এই সময় হতে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতেন।

মইসাগিরি রাজার পর তৎকালীন অক্স্রাদেশে আরও ২৬ জন চাকমা রাজা রাজত্ব করেছেন বলে চাকমা জাতির ইতিবৃত্তে জানা যায়। উক্ত ২৬ জনের শেষ রাজা ছিলেন অরুণ যুগ; আরাকানীরা তাঁকে বলতেন 'ইয়ংজ'।

চাকমা রাজাগণের উপরোক্ত ধারাবাহিক বিবরণ কতটুকু সত্য উহা সঠিক জানা না গেলেও, উহাদের মধ্যে অরুণ যুগের কথা অস্বীকার করা যায় না। অরুণযুগ বহুকাল রাজত্ব করার পর একদা আরাকানের জনৈক সামন্ত রাজা 'মেঙ্গদি' ব্রহ্মরাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়ে চাকমা রাজার সহিত প্রতারণাপূর্ব্বক প্রথমে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণ যুগ, তাঁর তিন পুত্র যথা ঃ সূর্য্যজিত (চৌজু), চন্দ্রজিত (চৌপ্রু) ও শক্রজিত (চৌতু), রাজার তিন রাণী, দুই কণ্যাকে বন্দী করা হয়। অতঃপর বাংলা ৭৪০ সনের ১৩ই মাঘ দশ সহস্র চাকমা প্রজাকে নিয়ে মগরাজার প্রধানমন্ত্রী ছাংগ্রাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

মেঙ্গাদি চাকমা রাজকণ্যা 'চমিখা'কে বিবাহ করেন এবং শক্রজিত (চৌতু) কে কাংজা নামক স্থানের জলকর তহসিল ভার অর্পণ করে। অপর দশ সহস্র চাকমা

প্রজাকে তাদের পূর্ব উপাধি পরিবর্তন করে ‘দৈংনাক’ আখ্যা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, মারমাদের পূর্বপুরুষগণ তঞ্চঙ্গ্যাদেরকে এককালে ‘দৈংনাক’ বলেই অভিহিত করতেন।

শত্রুজিত জলকর উশুল করতেন বলে চাকমারা তাঁকে ডাকতেন ঘাট্যারাজা বা ঘাটের রাজা। উক্ত ঘাট্যারাজার মৃত্যুর পর তদীয় এক পুত্র জলকর উশুল করার ভারপ্রাপ্ত হন কিন্তু একদা তহবিলের অর্থ আত্মসাত করায় মগরাজার ভয়ে তিনি মৈসাং (শ্রমণ) হন। উক্ত মৈসাংকে চাকমারা নাম দিলেন “মৈসাং রাজা।”

তৎকালে চাকমাগণ আরাকানীদের দ্বারা বহু লাঞ্ছনা ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। চাকমাদের তৎকালীন একটা গাঁথা ছিল নিম্নরূপ ঃ-

“যে যে বাপ্ ভাই যে যে যে,
চম্পক নগরত ফিরি যে।
এলে মৈসাং লালস নাই,
ন এলে মৈসাং কেলেস নাই।
ঘরত থেলে মগে পায়,
ঝারত গেলে বাঘে খায়।
মগে ন পেলে বাঘে পায়,
বাঘে ন পেলে মগে পায়।” ইত্যাদি

অর্থাৎ ঃ-

চল বাপ-ভাই চল যাই
চম্পক নগরে ফিরে যাই।
আসলে মৈসাং লালসা নাই,
না আসলে মৈসাং ক্লেশ নাই।
ঘরে থাকলে মগে পায়,
ঝাড়ে অর্থাৎ জঙ্গলে গেলে বাঘে খায়।
মগে না পেলে বাঘে পায়,
বাঘে না পেলে মগে পায়।”

কথিত আছে যে, মগরাজার লোকেরা তৎকালে খাজানা উশুল করার নামে চাকমাদের গৃহে গিয়ে পুরুষদিগকে পিছ-মোড়া বেঁধে সারারাত গৃহ প্রাঙ্গণে ফেলে রেখে দিত আর স্ত্রীলোকদের দিয়ে মদ তৈরী করিয়ে সেই মদ পান করতঃ স্ত্রীলোকদের উপর যথেচ্ছা পাশবিক অত্যাচার চালাতো।

অবশেষে মৈসাং রাজার পুত্র মারেক্যা ও তৈন্‌সুরেশ্বরীর নেতৃত্বে চাকমারা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামের আলীকদম নামক স্থানে পালিয়ে আসতে সমর্থ হন এবং তথায় তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা মোঃ জামাল উদ্দীন এর অনুমতিক্রমে ১২ খানি গ্রামের সমন্বয়ে একটা ক্ষুদ্র চাকমা রাজ্য গঠন করেন। উক্ত ১২ খানি গ্রামকে বলা হলো 'বারতালুক'।

উল্লেখ্য যে, তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বমোট যে ১২টা গছা বা দল আছে, উহারাই উক্ত বার তালুকের বসবাসকারী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যে ১২টা গছা আছে, এদের মধ্যে কথাবার্তা স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিচ্ছদ, সামাজিক রীতি-নীতির বিশেষ কোন মিল নেই বললেই চলে। সুতরাং উক্ত ১২ গছার লোকেরাই পৃথক পৃথক গ্রামে অর্থাৎ উক্ত বারতালুকে বসবাস করেছিলেন বলেই বিশ্বাস।

আলীকদমে বসতি স্থাপিত হওয়ার পর তথায় মৈসাং রাজার কনিষ্ঠ পুত্র তৈন্‌সুরেশ্বরীর নামানুসারে একটা নদী বা ছড়ার নাম রাখা হয় তৈন্‌ছড়ী। এই নদী বা ছড়া আলীকদমের কিঞ্চিৎ উত্তরে মাতামুহুরী নদীতে পতিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি তৈননদী বা তৈন্‌ছড়ী নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

খুব সম্ভব তখন আলীকদমের ১২ তালুকের লোকেরা তৈন্‌ছড়ীর পাহাড় অঞ্চলে জুম চাষ করতেন বলে তাদেরকে বলা হতো 'তৈন্‌-তং-য়্যা'। যেহেতু 'তৈন' একটা নদী বা ছড়ার নাম, 'তং' অর্থ আরাকানীদের ভাষায় পাহাড় এবং 'য়্যা' অর্থে জুমকে বুঝায়, সেহেতু উক্ত তৈন্‌ছড়ীর পাহাড় অঞ্চলের লোকদেরকে 'তৈন্‌-তং-য়্যা' নামে ডাকা হতো বলে বিশ্বাস।

খুব সম্ভব ‘তৈন্-তং-য়্যা’ শব্দটি তৎকালীন আরাকানী ভাষায় আগরতলা নিবাসী চাকমাদের মুখঃ নিঃসৃত। একটু মনযোগ সহকারে অনুধাবন করলে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র চাকমারাই তঞ্চঙ্গ্যাদিগকে এককালে আনক্যা বলে অভিহিত করতেন।

কারো কারো মতে, ‘তংফা’ থেকে ‘তংতঈঙ্গ্যা’ এবং আনক থেকে আনক্যা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এইরূপ মন্তব্য কোনমতেই গ্রহণ যোগ্য নহে। আরাকানী ভাষায় ‘তংফা’ অর্থ দক্ষিণ দিক। সুতরাং দক্ষিণের লোক বলে তংতঈঙ্গ্যা বা ‘তৈন্-তং-য়্যা’ নাম করণ হবে উহার কোন অর্থই হতে পারে না।

রাজা তৈন্সুরেশ্বরী প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল যাবত আলীকদমে রাজত্ব করার পর তদীয় পুত্র জনু রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। জনুর কোন পুত্র সন্তান ছিলনা। কেবল রাজেম্বী ও সাজেম্বী নামে দুই কন্যা ছিলেন। পরে রাজেম্বীর সহিত বুড়া বড়ুয়া নামক রাজার প্রধান সেনাপতির বিবাহ হয়। বিবাহের পর রাজেম্বীর সাত্তুয়া বড়ুয়া নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। রাজা জনুর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সূত্রে সাত্তুয়া বড়ুয়া (যিনি পাগলা রাজা নামে খ্যাত) সিংহাসনে লাভ করেন। একদা প্রজা বিদ্রোহে পাগলা রাজা নিহত হলে, তদীয় মহিষী একমাত্র কন্যা অমঙ্গলীকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে হিল ত্রিপুরায় (আগরতলায়) পলায়ন করেন এবং তথায় কুত্তার্য্যা নামে জনৈক ত্রিপুরা রাজ বংশীয় যুবকের সহিত অমঙ্গলীর বিবাহ হয়। কুত্তার্য্যার সহিত বিবাহের পর অমঙ্গলীর গর্ভে পীড়াভাঙ্গা বংশজ গুজা ও মেজা নামক দুই ভাই হতে ধারাবাহিক ভাবে পীড়াভাঙ্গা গুত্তি চলে আসছে। কুত্তার্য্যা মারা গেলে মুলিমাথংজা নামে জনৈক চাকমা অমাত্যপুত্রের সহিত অমঙ্গলীর পুনঃ বিবাহ হয় এবং মুলিমা থংজার ঔরসে ধুর্য্যা, কুর্য্যা ও ধাবানা নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। পাগলা রাজার মৃত্যুর পর রাজ সিংহাসনের দাবী নিয়ে বিভিন্ন দলের প্রধানদের মধ্যে প্রবল গোলযোগ দেখা দিল। এমতাবস্থায় বহু বৎসর কেটে যাওয়ার পর অবশেষে সমস্ত দলপতিদের সম্মতিক্রমে অমঙ্গলীর পুত্র ধাবানাকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হল।

চাকমা রাজন্যবর্গের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে- রাজা বিজক্গ্রী থেকে আরম্ভ করে সাত্তুয়া রাজা (পাগলা রাজা) পর্যন্ত যে সমস্ত রাজা ছিলেন তাঁরা ছিলেন রোয়াঙ্গ্যা, আর ধাবানা থেকে আরম্ভ করে বর্তমান চাকমা রাজা পর্যন্ত রাজারা হলেন আনক বা আগরতলার। ধাবানা রাজা হয়েই চাকমা

জাতির সমাজ সংস্কার করেছিলেন বলে চাকমা জাতির ইতিবৃত্তে জানা যায়। তৎকালে অনেক রোয়াঙ্গ্যা চাকমা আনক্যা চাকমা সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বমোট ১২টা গছা[১] বা দল। উক্ত ১২টা গছার মধ্যে বর্তমানে ৬টা গছার লোক বাংলাদেশে বসবাস করছেন এবং অবশিষ্টরা এককালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে থাকলেও চাকমা রাজা ধরমবক্স খাঁর আমলে আবার আরাকান চলে যান। তাদের আরাকান চলে যাওয়ার পেছনে একটা সুন্দর গল্প আছে। "একদা ধন্যাগছা ও লাপোস্যা গছার লোকদের মধ্যে 'উয়্যাপৈ' নামে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যাপার নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হন এবং উভয় পক্ষই রাজা ধরম বক্স খাঁর দরবারে বিচারের সম্মুখীন হন। ইতোমধ্যে ধন্যাগছার লোকেরা কৌশলে রাজাকে খুশী করার জন্য চাঁদা উঠিয়ে চট্টগ্রাম শহরে একটা সুদৃশ্য পাকা গৃহ নির্মান করে দেন। যথাকালে বিচার হয় এবং বিচারে লাপোস্যা গছার পরাজয় হয়। অতঃপর রাজার প্রতি বিরক্ত হয়ে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চল ত্যাগ করে আবার আরাকানে চলে যায়। খুব সম্ভব বিবাদটা কেবল দুই গছা লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; অন্যান্য গছার লোকও উহাতে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে- তঞ্চঙ্গ্যারা বর্তমানে চট্টগ্রাম, পার্বত্য অঞ্চলে কিছু অংশ ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করছেন।

উল্লেখ্য যে- উক্ত বিবাদের ফলে যে কতিপয় গছার লোক আরাকানে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অঙ্যগছা নামক একদল লোক উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাইংখ্যং এর ১২০নং ছাক্রাছড়ি মৌজায় আগমন করে। কোন কোন লোকের ধারণা তাদের কোন গছার নাম নির্দিষ্ট ছিল না বলেই তাদেরকে অন্যগছা বা অঙ্যগছা বলে অভিহিত করা হয়। যা হোক- বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে

পাদটীকা সমুহ চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক সংযোজিত।

১। ১২ গছার নাম হলো- (১) ধন্যা গছা, (২) কার্রয়া গছা, (৩) মোঅ গছা, (৪) মংলা গছা, (৫) মেলং গছা, (৬) লাং গছা বা লাম্বাৎসা গছা, (৭) তাস্সি গছা, (৮) লাপস্যা গছা, (৯) তামলুক গছা, (১০) রাঙী গছা, (১১) আঙু গছা ও (১২) অঙ্য গছা।

তঞ্চঙ্গ্যাদের যে প্রধান ৬টা গছার লোক রয়েছে, তাদের গছা ও গুত্তির পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

গছা বা দল	গুত্তি বা গোষ্ঠি
১। মো গছা	তাশিগুত্তি, কবাল্যাগুত্তি, আগারাগুত্তি, খুশ্বাগুত্তি, দাল্যাগুত্তি, গুণ্যাগুত্তি ও কুরুগগুত্তি।[২]
২। কার্বোয়া গছা	গছাল্যাগুত্তি, ফারাংশাগুত্তি, লাপোস্যাগুত্তি, আর্গোয়াগুত্তি, বক্ছাড়াগুত্তি, তাশিগুত্তি, বুঙগুত্তি ও বলাগুত্তি।[৩]
৩। ধন্যা গছা	পশোয়গুত্তি, পণ্ডিতগুত্তি, তাঞ্জাবগুত্তি, কালা থংজাগুত্তি, বন্ধ্যবগুত্তি, পিশোগুত্তি, রাঙেয়্যাগুত্তি, বলাগুত্তি ও বাঙ্গাল্যাগুত্তি।[৪]
৪। মংলা গছা	পালংশাগুত্তি, দারুণ্যাগুত্তি, নাবানাগুত্তি, দেবাগুত্তি ও কালেয়াগুত্তি।
৫। মেলং গছা	আমেলাগুত্তি, আলুগুত্তি, তেমেলেগুত্তি ও পক্তগুত্তি।
৬। লাংগছা	বেদবগুত্তি, শক্কাগুত্তি, লাম্বায়াগুত্তি, পায়াগুত্তি ও বলাগুত্তি।

অন্যান্য গছাদের গুত্তির বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।[৫]

কারো কারো ধারণা যে, যে সকল চাকমা প্রজা তৈন্‌সুরেশ্বরীদের নেতৃত্বে আলীকদম এসেছিলেন, তাঁরা বনের পথে পালিয়ে আসার সময় স্থানে স্থানে বন্য

পাদটীকা সমুহ চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক সংযোজিত।

২। মো গছায় এসব গুত্তি ছাড়াও আগাগুত্তি নামে আরেক গুত্তির নাম জানা যায়।

৩। কার্বাগছার গুত্তির তালিকায়- বাঙালগুত্তি, লাম্বাসাগুত্তি ও বোগুত্তি নামে আরও তিনটি গুত্তির নাম জানা যায়।

৪। ধন্যাগছায় দান্নোয়াগুত্তি, খাত্তলগুত্তি, বোগুত্তি, বগাগুত্তি, রাঙাকাঙাগুত্তি, আমিলাগুত্তি, কালংসাগুত্তি, তান্যাবোগুত্তি ও কালামেলাগুত্তি নামে আরও নয়টি গুত্তি বর্তমান।

৫। তঞ্চঙ্গ্যা বর্ণমালা শিক্ষা নামক পুস্তকে অঙ্যগছা লোকদের তিনটি গুত্তির নাম পাওয়া গেছে- কালামালাগুত্তি, আলুগুত্তি ও বলাহ্গুত্তি।

কলা গাছা কেটে পথের চিহ্ন রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের পরবর্ত্তী আর একদল স্বাজাতিদের সহিত মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, কর্তিত কলা গাছের আগা বা ডিগ্ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং উহা দেখে তাঁরা ভাবলেন যে, যাঁরা পূর্বে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা অনেক আগেই সেস্থান ত্যাগ করে গেছেন। সুতরাং তাঁদের সহিত মিলিত হওয়া সম্ভব হবে না মনে করে আর অগ্রসর না হয়ে যার যেখানে সুবিধা বোধ হলো, তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করে রইলেন। পরে যখন জানতে পারলেন যে, পূর্ববর্ত্তীদল আলীকদমে বসবাস করছেন তখন তাঁরাও ক্রমে ক্রমে আলীকদমে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু আসলে কি হবে, তাঁদেরকে দলে স্থান দেওয়া হলো না। তাই তাঁরা আলীকদমের পার্শ্ববর্তী পাহাড় সমুহে বসতি স্থাপন করে রইলেন এবং তাঁরাই পরবর্ত্তীকালে ‘তৈন্-তং-য়্যা’ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

কিন্তু নাক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ফারিয়াখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ ধুং অং চাক্ মহাশয়ের উক্তি মতে, যে দলটি বন্য কর্তিত কলা গাছের আগা বা ডিগ্ দেখে প্রথম অবস্থায় আলীকদমে আগমন স্থগিত রেখেছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে এসেছিলেন, ওঁরাই বর্তমান চাক্ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। এ’রূপ ঘটনার কথা নাকি চাক্ সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অদ্যাবধি বলে থাকেন।

অবস্থান

তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতিরা বর্তমানে যে সমস্ত অঞ্চলে বসবাস করছেন, সে সমস্ত স্থান হলো, রাঙ্গামাটি চাকমা সার্কেলে ঃ রাঙ্গামাটি, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, বেতবুনিয়া, রইস্যাবিলি, ওয়াগ্গা, কাপ্তাই, রাইংখ্যং, ঠেগা, সুবলং এবং বোমাং সার্কেলে বান্দরবান, বালাঘাটা, সুয়ালক, নোয়াপতং, রোয়াংছড়ি, কুক্ষ্যাং, পাইন্দুং, রেমাক্রী, আলীকদম, তৈন্গাঙ, চৈক্ষং, মাতামুহুরী, তক্রু, নাইক্ষ্যংছড়ি, পালং, রেজু, ভালুক্যা ইত্যাদি।

চাকমা ও বোমাং সার্কেলে বসবাসরত তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতির তুলনায় বার্মা ও ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা, মিজোরাম ইত্যাদি স্থানে অনেক বেশি বসবাস করছেন বলে অনেকের ধারণা।

জনসংখ্যা

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কেহ কেহ নামের পেছনে চাকমা লিখে থাকেন। সুতরাং আদম শুমারী কালে তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রকৃত জনসংখ্যার হিসাব পাওয়া যায় না। তবুও ১৯৭৪ ইং সনে বাংলাদেশে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ছিল ৪,৭১৬ জন এবং ১৯৮১ ইং সনের আদম শুমারী মতে ২০,০০০ (বিশ হাজার জন)।[৬]

জুমচাষ

তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কেবলমাত্র জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। তাই এরা প্রতিবছর এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে অথবা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে জুম করে থাকে। এক কথায় এদেরকে পাহাড়ি যাযাবর বললে অত্যুক্তি হয় না। এদের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা নেই বললেই চলে। যখন যেমন তখন তেমন ভাবে জীবন যাপন করাই এদের স্বভাব।

সাধারণত পৌষ থেকে ফাগুন মাস পর্যন্ত জুম কাটার উপযুক্ত সময়। জুম কাটা অর্থ পাহাড়ে ধান্য বপন করার জন্য জঙ্গল কাটার কাজকে বুঝায়। প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার অন্ততঃ দুই একর থেকে দশ একর পর্যন্ত জঙ্গল কেটে জুমের স্থান প্রস্তুত

পাদটীকা সমুহ চন্দ্রসেন তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক সংযোজিত।

৬। বাংলাদেশ সরকারে আদমশুমারী অনুসারে তঞ্চঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা নিম্নরূপ- ১৯৯১ সালে ২১,০৫৭ জন; ২০০১ সালে ৩১,১৬৪ জন; ২০১১ সালে ৪৪,২৫৪ জন। কিন্তু ৩রা মার্চ ২০১৩ সালে প্রকাশিত প্রথম আলোর হিসাব মতে ৫১,৭৭৩ জন। আবার ১৮১৫ সালে বৃটিশদের হিসাব মতে প্রায় ২,৮০০ জন।

করে। জুমের জায়গা কম বেশী হলেও খাজানা কম বেশী হয়না। বার্ষিক ৭ টাকা জুম খাজানা দিতে হয়।

জুমিয়াদের জুম নির্বাচনের একটা রীতি হলো, জুম কাটার আগে নির্বাচিত জঙ্গলের কিছু অংশ কেটে একটা বাঁশ কিম্বা কচি গাছের আগায় দু'খানা গাছের খণ্ড দ্বারা ক্রশ চিহ্ন দিয়ে রাখা অবশ্যই আবশ্যক। ইহাকে বলা হয় 'জুম মাছ্যা দেনা' অর্থাৎ জুমে চিহ্ন দেওয়া। কোন লোকের মাছ্যা দেওয়া জুমে অন্য কেউ দখল নিতে গেলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির দাবী যদি সপ্রমাণিত হয়; জাতীয় বিচারে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতি দখল ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাবতীয় মোকর্দমার খরচ ও ডিক্রী পেয়ে থাকে। তবে কথা হলো এই বিবাদের জঙ্গলটা যার 'রান্যা' অর্থাৎ এর আগে যে ব্যক্তি সেখানে একবার জুম করেছে, তাতে তার দাবীই অগ্রগণ্য।

জুম কাটার সমাপ্ত হলে কমপক্ষে উহা একমাস যাবৎ রৌদ্রে শুকাতে দেওয়া হয় এবং চৈত্র মাসের শেষের দিকে উহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি ভিজে নরম হলে উহাতে দা'ও দ্বারা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে একই সঙ্গে ধান, কার্পাস ও ভুট্টা বীজ বপন করা হয় এবং তিল, মরিচ, বেগুন ইত্যাদির বীজ ছিটানো হয়।

জুমে ধান্য বপন করার কাজকে বলা হয় 'ধান কুচা'। ধান কুচা থেকে ধানের শীষ বের হওয়া পর্যন্ত সময়ে অন্তত ৩বার জুমের আগাছা সমুহ দা দ্বারা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

সাধারণত শ্রাবণের শেষের সময় থেকে জুমের ধান্য পাকতে শুরু করে। এই সময় শশা (মারফা), চিনার, ভুট্টা ইত্যাদি খাওয়ার সময় হয়। সুতরাং জুমিয়াদের মনে তখন কি যে আনন্দ!

একদা এমন এক সময় ছিল, এক আড়ি ধান্য জুমে বপন করলে ৭০/৮০ আড়ি ধান্য ফলন হতো। সুতরাং ৮/১০ আড়ি ধান্যের জুম করলে জুমিয়াদের সারা বছরের খোরাকী হয়ে যেত এবং একই সঙ্গে তরিতরকারীরও কোন অভাব হতো না। জুমের উৎপন্ন তিল, কার্পাস বিক্রয় করে বাজার থেকে কেরোসিন, লবণ

ইত্যাদি ক্রয় করার টাকা পাওয়া যেতো। সুতরাং জুমিয়াদের সংসারে অভাব বলতে থাকতো না।

আজ থেকে অন্তত পঞ্চাশ বছর পূর্বে লোকসংখ্যা ছিল এখনকার তুলনায় অনেক কম এবং লোক অনুপাতে জুমের স্থান ছিল বিস্তৃত। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সে হিসাবে জুমের জায়গা বৃদ্ধি পায়নি বরং প্রতি বছর অগ্নিদাহের ফলে ভূমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে এবং জুমের জায়গাও ক্রমে কমে এসেছে। বর্তমানে জুমিয়ারা জুমে চাষ করে ৩ মাসের অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারে না। একবার যেখানে জুম করা হয় উহাতে পুনরায় জুম করতে গেলে কমপক্ষে ৩ বছর অতিক্রান্ত হতে হয়। সুতরাং যেখানে ভাল জুমের সন্ধান পাওয়া যায় জুমিয়ারা তথায় চলে যায়।

সে কাল আর এ কাল

প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্র এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম,
সবুজের সমারোহ এর নয়নাভিরাম।
শৈলচুড়ায় ফাঁকে ফাঁকে ঝরণার ধারা,
আঁকা বাঁকা ঝিরি বাঁকে নাচে আত্মহারা।
ঝিরঝির সমীরণে তনু-মন শিহরিত,
পাপীয়ার কাকলীতে বনভুমি মুখরিত।
কলনাদে ঝিরি নদী বহে অবিরাম,
দুই তীরে স্থানে স্থানে পাহাড়িয়া গ্রাম।
চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা আর বম,
খিয়াং, মুরুং সবাই ভাই-ভাই সম।
মিলেমিশে বাস করে জানে না বিভেদ,
দারিদ্র্য পীড়িত সদা তবু নাহি খেদ।
বিচিত্র এই পাহাড়িদের সংসার জীবন,

আদিম মানব গোষ্ঠি দেখায় যেমন।
অতীতে এই পাহাড়িরা করে জুম চাষ,
অশেষ সুখের মাঝে করেছিল বাস।
গোলা ভরা ধান ছিল প্রতি ঘরে ঘরে,
আনন্দ উৎসব ছিল সারা বর্ষ ধরে।
রাধামন ধনপুদির পালাগীত শোনে,
কেটে দিত কত রাত বিনিদ্র নয়নে।
ওয়াক্‌শা, পাংকুম আর কাপ্যাগীত গেয়ে,
মনপ্রাণ ভরে দিত মারমাদের মেয়ে।
বড় বড় পৈ ভাঙে লোক সমাগমে,
উৎসব মুখর ছিল পাহাড়িয়া গ্রামে।
চৈত্র সংক্রান্তিকালে মহামুনি গিয়ে,
যথা ইচ্ছা ভ্রমিয়াছে প্রিয়জন নিয়ে।
প্রিয় আর প্রিয়া মিলে হাসি তামাশায়,
জীবন দিয়েছে ভরে সুখ মদিরায়।
কিন্তু আজ সেইকাল হয়েছে অতীত,
দারিদ্র্যের কষাঘাতে সদা জর্জরিত।
জুম চাষ করে আর ধান্য নাহি পায়,
পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র অর্দ্ধ পেটা খায়।
কোথা গেল সেই শান্তি কোথায় উৎসব,
পৈ ভাঙ হয় না গ্রামে সকলি নীরব।
মহামুনি মেলা আর বসেনা তেমন,
রাধামন ধনপুদি পালা শোনে না এখন।
সেকাল আর এ কালের বহু ব্যবধান,
হবে কি কখনো এর কোন সমাধান?

খেলাধুলা

তঞ্চঙ্গ্যা ছেলে-মেয়েরা যে সমস্ত খেলাধুলা করে থাকে সেগুলো হলো গয়াংখালা, পুত্তিখালা, আহ্ণীখালা, লুগালুগি খালা, গুদুখালা, বুলিখালা, খবামা খালা ইত্যাদি। খেলাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'খালা'।

(১) গয়াংখালা ঃ এই খেলাকে 'পো-খালা' অর্থাৎ পুকুর খেলাও বলা হয়ে থাকে। এই খেলা খেলবার নিয়ম হলো- দুই পক্ষে সমান সংখ্যক বালক থাকে। এক পক্ষে যতজন বালক থাকে, সমতল ভূমিতে ততটি কামড়া চিহ্ন দিয়ে ভাগ করা হয় এবং মাঝখানে একটা লম্বালম্বী দাগ বা চিহ্ন দেয়া হয়। এগুলোর প্রত্যেকটিকে এক-একটা 'পো' অর্থাৎ পুকুর বলা হয়। সম্মুখস্থ দাগে যে বালকটি থাকে, তাকে রাজা বলা হয়। সে ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটি লাইনে গিয়ে বিপক্ষ দলের যে কোন বালককে স্পর্শ করতে পারে। একদল বালক এক-একটা পুকুর রক্ষা করে, হাতে বিপক্ষ দল পুকুরে প্রবেশ করতে পারে না। বিপক্ষ দলের যে কোন বালক অপর দলে বিনাস্পর্শে সম্মুখস্থ পুকুর থেকে পিছনের পুকুর অতিক্রম করতঃ পুনরায় সম্মুখস্থ পুকুর অতিক্রম করতে সক্ষম হলে সে দলের জয় হয়। এরূপে পালাক্রমে খেলা চলে। খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয় কোন দল কতবার বেশী জেতলো তার হিসাব মতে।

(২) পুত্তিখালা ঃ এই খেলায়ও পক্ষ বিপক্ষ থাকে। ছেলে ও মেয়ে একই সঙ্গে খেলতে পারে। খেলার নিয়ম হলো- ছেলে মেয়েরা দু'দলে ভাগ হয় এবং একদল একটা গোলাকার বৃত্তে অবস্থান করে অপর দল বৃত্তের বাহিরে অবস্থান করে। বৃত্তের কোন ছেলে বা মেয়ে এক নিঃশ্বাসে পুত্তি শব্দ করে বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে অপর দলের যে কোন একজনকে স্পর্শ করণার্থে দৌঁড়ে যায়, অপর দলের ছেলেমেয়েরা ধরা দেয় না। ধরতে দিয়ে স্পর্শ করতে পারুক বা না পারুক নিঃশ্বাস শেষ না হতেই আবার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। নতুবা আপ্পআ বলে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আপ্পআ না বললে বৃত্তের বাহিরে অপর দলের ছেলেমেয়েরা স্পর্শ করতে পারলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হয়। নিঃশ্বাস শেষ হবার আগে যদি 'আপ্পআ' বলে একস্থানে দাঁড়িয়ে যায় তৎক্ষেত্রে বৃত্ত থেকে অপর আরেকজন পুত্তি

শব্দ করে সেই মৃতকে বৃত্তে ফেরত আনতে পারে। সেও যদি নিঃশ্বাসে কুলাতে না পারে তাকেও সঙ্গীটিসহ আপ্পআ বলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং অপর আরেকজনকে বৃত্ত থেকে পুত্তি শব্দ করে সঙ্গীদের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। বৃত্তের বাহিরে পুত্তি শব্দ করার সময়ে যদি বাহিরের অপর দলের কাউকেও স্পর্শ করা যায়, সেক্ষেত্রে যাকে স্পর্শ করা হয় তাকে মৃত বলা হয়। কিন্তু বৃত্তের বাহিরে শব্দ বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে আপ্পআ না বললে অপর দলের ছেলেমেয়ো তাকে স্পর্শ করতে পারলে পূর্বের মৃতরা জীবিত হয় এবং বৃত্ত থেকে যে গেছে তাকে মৃত বলা হয়। অপর দল বৃত্তে অবস্থান করে খেলা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে।

(৩) আঙ্গী খালা ঃ আংটিকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় আঙ্গী বলা হয়। এই খেলার নিয়ম নিম্নরূপের। দু'দিকে দুই দল সমান সংখ্যক বালক এই খেলায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম দল একটা আংটিকে মাটির একটা গর্তে লুকিয়ে রাখে। অপর পক্ষ উক্ত আংটিটা খোঁজে বের করে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু প্রথম পক্ষ তাদেরকে বাধা দেয়। দ্বিতীয় পক্ষ জোরপূর্বক আংটি বের করে নিতে পারলে প্রথম পক্ষের পরাজয় হয় এবং পরবর্ত্তীতে দ্বিতীয় পক্ষ আংটি গর্তে লুকায় ও প্রথম পক্ষ জোর করে উহা বের করতে সচেষ্ট হয়।

(৪) লুগালুগি খালা বা তগাতগি খালা ঃ লুগালুগি অর্থ লুকানো আর তগাতগি অর্থ খোঁজ করাকে বুঝায়। এই খেলায় একদল বালক লুকানো অপর দলকে খোঁজ করবে। দলের শেষ বালকটি পর্যন্ত খোঁজ করে ধরতে পারলে খেলায় জিত হয়।

(৫) গুদু খালা ঃ ইহা হা ডু ডু খেলা।

(৬) বুলি খালা ঃ ইহা বলি খেলা বা কুস্তিলড়াই।

(৭) করেঙ্গা বা খাবামা খালা ঃ ইহা কানামাছি খেলা।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহ্ পদ্ধতি

তঞ্চঙ্গ্যাদের বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এখানে আমি তঞ্চঙ্গ্যা মো গছার বিবাহ্ পদ্ধতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

মো গছা লোকদের সাধারণত ৩ প্রকারের বিবাহ্ পদ্ধতি রয়েছে।

১। কন্যার গৃহে বরকে নিয়ে বিবাহ।
২। মনঃ মিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ।
৩। রাণী মেলার সাঙা অর্থাৎ বিধাব বিবাহ ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বিধাব রমণীকে ‘রাণী’ এবং মেয়ে বা স্ত্রী লোককে বলা হয় ‘মেলা’।

যদি কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা বিধাব রমণী পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যায় তৎস্থলে অতি সাধারণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা হয়। উহাকেই বলা হয় রাণী মেলার সাঙা। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বিবাহকে বলা হয় ‘সাঙা’। বর্তমানে মো গছাদের মধ্যে প্রায় যুবক-যুবতীর বেলায় উক্ত সাঙার পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। এই সাঙার পদ্ধতি অতি সাধারণ এবং অনাড়ম্বর। এতে বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেই নির্দিষ্ট সময়ে কনের গৃহ বিবাহ কর্ম সম্পাদিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা বিবাহ মন্ত্রের মাধ্যমে বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা হয়।

মনঃ মিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। যেমন ঃ কোন যুবক যুবতী বিবাহের উদ্দেশ্যে রাতে কিম্বা দিনের বেলায় গোপনে কোথাও বা ছেলের গৃহে পালিয়ে যায়। উহাকে বলা হয় ‘ধে যানা’। ধে যানা অর্থ পালিয়ে যাওয়া। পরের দিন ওদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ মেয়ের বাবা মায়ের নিকট পৌঁছানো হয় এবং অন্য আর একদিন ছেলের বাবা অভাবে অভিভাবকরা মেয়ের বাবার গৃহে ‘পৈ’ গছাতে যান। এখানে ‘পৈ’ অর্থ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত নাড়িভুড়ি বর্জিত একটা গোটা সেদ্ধ করা মোরগ ও দুই বোতল মদ উপঢৌকনকে বুঝায়।

বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে বিবাহ দেবার ইচ্ছা থাকলে উক্ত পৈ গ্রহণ করেন। পলায়নের মাধ্যমে যে বিবাহ হয় উহাকে বলা হয় 'ছিনালী সাঙা'। 'ছিনালী সাঙা' অর্থ দোষণীয় বিবাহ। উক্তরূপ বিবাহে ছেলেকে ১২ টাকা এবং মেয়েকে ৬ টাকা জরিমানা করা হয়। বর্তমানে ছেলেকে ২৫ টাকা এবং মেয়েকে ১২ টাকা জরিমানা করা হয়। বিবাহ হউক বা না হউক উক্ত জরিমানার টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। ইহা ব্যতীত পাড়ালীয়ার মান হিসাবে একটা মর্দা শুকর ছেলে ও মেলে উভয়কে জরিমানা করা হয় এবং ওই শুকর বধ করে কোনও এক অবস্থাপন্ন বা পাড়ার কারবারীর গৃহে পাড়ালীয়ারা একত্রে মিলে রন্ধন করে খায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত শুকরের পরিবর্তে ৫ টাকা জরিমানা করা হয় এবং বিচারকালে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যতজন পুরুষ উপস্থিত থাকে উক্ত টাকা তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন করে দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় ছিনালী শুগ খানা। শুকরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'শুগ'।

বিবাহ কর্ম সম্পাদিত হয় মেয়ের পিতৃগৃহে। বিবাহে কোনরূপ আড়ম্বরতা নেই। কেবল ছেলে ও মেয়ে উভয়ে মেয়ের বাবা মায়ের কাছে একটা 'পৈ' গছিয়ে আশীর্বাদ নেয়। ইহাকে বলা হয় 'সেপ মাগানা'।

'সেপ মাগানা' অর্থ আশীর্বাদ চাওয়া। ছেলে ও মেয়ে পলায়নের পর মেয়ের বাবা ও মা ইচ্ছা করলে বিচারের দিন মেয়েকে ফেরত নিতে পারে। উহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু পর পর যদি ছেলে ও মেয়ে একত্রে মিলে তিনবার পালিয়ে যায় তৎক্ষেত্রে শেষ বারে মেয়ের বাবা-মা তার মেয়ের উপর আর কোন দাবী করতে পারে না। বিচারের আগে ছেলে মেয়ে যতবার পালিয়ে যাক না কেন, উহাদের কেবল একবারই জরিমানা দিতে হয়। মেয়ের বাবা যত টাকা ইচ্ছা ছেলের নিকট দাবী করতে পারে এবং ওই দাবী অবশ্যই পৈ গ্রহণের আগে করতে হয় নতুবা পরবর্তীতে তার কোন কিছু দাবী করার উপায় থাকে না। উক্ত দাবী করাকে বলা হয় 'দা-বা'। দা-বা অর্থ দাবী। মেয়ের মাতা দুধালী টাকা হিসেবে ৭ টাকা পর্যন্ত দাবী করতে পারেন।

মনঃ মিলনে পলায়নের মাধ্যমে বিবাহ আজকাল তঞ্চঙ্গ্যা মো গছার বেলায় অধিক প্রচলিত। এর কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যতপ্রকার বিবাহ পদ্ধতি থাকুক, উহাদের মধ্যে একটা মাত্র সামাজিক প্রথাসিদ্ধ বিবাহ রীতি হলো- আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ কর্ম সম্পাদন করা। ছেলের জন্য বৌ আনয়নের সময় হলে ছেলের বাবা কোন এক মনোনীতা মেয়ের বাবার কাছে খবর দেন যে, তিনি মেয়ের বাবার কাছে এক পিলাং মদ উপস্থাপন করতে চান। মেয়ের বাবা মেয়েকে বিবাহ দেবার ইচ্ছা থাকলে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অতপর ছেলের বাবা পর-পর ৩বার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মেয়ের বাবার গৃহে যাতায়াত করেন।

অতপর বিবাহের দিনে বরকে সাজিয়ে কনের গৃহে নেওয়া হয়। বরের পেছনে বরের ছোট বোন অথবা ঐ সম্পর্কের পাড়ালীয়া কোন কিশোরী অথবা যুবতী মেয়ে বরের মাথার পাগড়ীর এক প্রান্ত হস্তে ধারণ করতঃ মাথায় 'ফো-কালং' চাপিয়ে কনের গৃহে যাত্রা করে। ফোকালং অর্থ কনের জন্য নতুন পোশাক ও গহনাপত্রাদি ভর্তি একটা শিল্প সম্মত বেতের ঠুরুং বিশেষ।)

যথাসময়ে বর পক্ষ কনের গৃহে পৌঁছলেও তাদেরকে সরাসরি গৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। বর পক্ষ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কনেকে গৃহের মধ্যবর্তী কোন এক কক্ষে কাপড়ের আড়ালে রাখা হয়। ইহাকে বলা হয় 'বৌ-লুগানা' অর্থাৎ বৌ লুকানো। কনের সহিত আরও একজন যুবতী মেয়ে সম্ভবতঃ কনের বান্ধবীও লুকানো অবস্থায় থাকে। মজার ব্যাপার, যতক্ষণ কনেকে বিবাহ বাসরে লুকানোর কাজ সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বর পক্ষকে গৃহ উঠানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কনে লুকানোর কাজ সমাপ্ত হলে কনে পক্ষের একজন খুব সম্ভব কনের বড় ভগ্নীপতি সম্পর্কের এসে বরের মাথার সামান্য উপর ভাগে শূন্যের উপর একটা মুরগীর ডিম বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে দিয়ে ডিমটা বরের পেছনের দিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং বরের হস্তধারণ করতঃ যেখানে কনে লুকানো আছে তথায় বরকে নিয়ে বসিয়ে দেয়। ইহাকে বলা হয় 'জামাইতুলা'।

অতপর ফোকালং থেকে যাবতীয় পোশাক ও গহনা পত্রাদি বের করে একস্থানে সাজিয়ে রাখা হয় এবং কনের সহিত যে মেয়েটি লুকানো থাকে সে কাপড় উন্মোচন করতঃ কনেকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। বরকে এমন স্থানে বসানো হয় যাতে কাপড় উন্মোচন করা সত্ত্বেও সে কনেকে দেখতে না পায়। কনেকে বর পক্ষের

আনীত বস্ত্র ও গহনাদি দ্বারা সজ্জিত করতঃ চুল আচড়িয়ে ভালোভাবে খোঁপা বেঁধে দিয়ে বরের বাম পাশে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। বরকে যে ব্যক্তি উঠান থেকে বিবাহ বাসরে আনয়ন করে এবং কনের সাথে যে মেয়েটি লুকানো থাকে ওদেরকে বলা হয় 'ছাবালা'। ছাবালা অর্থ ঘটক। উক্ত ছাবালাদ্বয় বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকে।

প্রথমত ছাবালায় মিলে বর ও কনেকে পাশাপাশি করে একটা শ্বেতবস্ত্রখণ্ড দ্বারা কোমড়ে বন্ধন করে দেয় এবং উপস্থিত গণ্যমান্য লোকদের উদ্দেশ্যে বলে 'ও বুড়াবুড়ি পাড়াল্যা গণমান্য লোক, অমুক অমুকীর লাত্তং বাণিদিত্তে। তা-নে ফং গুই দিবার হুগুম আগেনে নাই? অর্থাৎ হে পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, অমুকের সাথে অমুকীর বিবাহের জন্য জোড়া বেঁধে দিচ্ছি; এতে আপনাদের হুকুম বা সম্মতি আছে কি নাই? (লাত্তং অর্থ বিবাহ এবং ফং অর্থ একত্র করা)।

উক্ত প্রকারে পরপর ৩বার প্রশ্ন করা হয় কিন্তু কেবলমাত্র শেষের বারে একবার 'আগে' (আছে) বলে উত্তর দেওয়া হয়। এরপর পুরুষ ছাবালা বরকে এবং মেয়ে ছাবালা কনেকে কোমরে জড়িয়ে ধরে ৭ বার বসা অবস্থাতেই উঠানো নামানো করে দেয়। একে বলা হয় 'নাচে দেনা'। এর অর্থ হলো বিবাহে সম্মতি প্রাপ্ত হওয়ায় বর-কনের আনন্দে নৃত্য করা।

অতপর বর ও কনের ডান হাত একত্রিত করে দিয়ে মঙ্গল ঘটের পানি সিঞ্চন করে দেওয়া হয়। এইরূপে বিবাহ কর্ম সম্পন্ন হলে, বর ও কনেকে উপস্থিত বয়োবৃদ্ধদের নিকট নিয়ে গিয়ে একজন একজন করে প্রণাম করতে দেওয়া হয়। এবং ঐ সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠরা পৈদাং থেকে তুলা ও তণ্ডুলসহযোগে বর-কনের মাথায় খবঙে (পাগড়ীতে) গুজে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ইহাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'ছেপ্ দেনা' (আশীর্বাদ দেওয়া)। বিবাহের পর ৭ দিন যাবত বরকে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করার নিয়ম আছে। অতপর কনেকে নিয়ে বর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে বিবাহে বৈধ ও অবৈধ

বৈধ বিবাহ

সম্পর্কের বেলায় ঘনিষ্ঠ কিম্বা দূরের হোক মামাতো, পিসতুতো, মেসতুতো ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে। বড় ভাই এর শ্যালীকা, বড়বোনের ননদ, বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার বিধাব অথবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা চলে। শ্যালক কিম্বা সম্বন্ধীর বিধাব অথবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা চলে। শ্যালীকা কিম্বা একই পরিবারভুক্ত না হলে পিতামহ অথবা মাতামহ সম্পর্কের নাতনীর বিবাহ হতে পারে।

অবৈধ বিবাহ

সহোদরাভগ্নী, বিমাতা, ভগ্নী, ভাইঝি, মামী, পিসী, মাসী, চাচী, জেঠি ইত্যাদি সম্পর্কীয়া হলে বিবাহ করা চলেনা। সহোদর ভ্রাতাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে, একই পিতার ঔরসে ভিন্ন মাতার ছেলে-মেয়ের মধ্যে, একই মাতা কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসজাত ছেলেমেয়েদের মধ্যে, স্ত্রীর বড় বোন অথবা স্ত্রীর বিমাতা, স্ত্রীর ভাইঝি ইত্যাদি বিবাহ করা চলে না।

কেহ অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ করলে জরিমানা ও সমাজ থেকে বহিষ্কার উভয় শাস্তিই একত্রে করা হয়ে থাকে। যদি কেহ উপরোক্ত অবৈধ বিবাহ করে, জাতীয় বিচারে হেডম্যান সর্বোচ্চ ২৫ টাকা ও রাজা বাহাদুর ৫০ টাকা অপরাধীকে জরিমানা করতে পারেন। তদুপরি উপরোক্ত অবৈধ সম্পর্কের বিবাহিত নরনারী দু'জনকেই মাথার চুল খণ্ড খণ্ড করে ছেঁটে দিয়ে কোন এক বটবৃক্ষের গোড়ায় বহু ছিদ্র বিশিষ্ট কলসী দ্বারা ১০০ কলসী বা ৫০০ কলসী জল ঢালতে দেওয়া হয়। পুরুষ অপরাধীকে অতিরিক্ত শাস্তি স্বরূপ মুরগীর খাঁচা গলায় বেঁধে দিয়ে চেরা বাঁশের ঢেরা পিটিয়ে নিজের অপরাধের কথা বলে বলে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে দেওয়া হয়। অতপর পরিশুদ্ধিতার জন্য অপরাধী দু'জনকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে পবিত্র মঙ্গল সূত্রাদি শ্রবণ করতে হয়।

উপরোক্ত শাস্তিপ্রাপ্ত নারী কিম্বা পুরুষ উক্ত নির্দেশগুলো প্রতিপালন না করা পর্যন্ত তাদেরকে সমাজচ্যুত বলে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদি করা নিষিদ্ধ। ইহাকে বলা হয় 'পাতের বার'।

বিবিধ

(১) কোন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি মনের মিল না হলে সেক্ষেত্রে আপোষে উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক হতে পারে। তৎক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পাড়ার কারবারী কিম্বা মৌজার হেডম্যানের নিকট গিয়ে ছাড়াছাড়ি বা তালাকনামা সম্পাদন করে। ইহাকে বলা হয় 'শুগ কাগচ্ দেনা'।

(২) যদি স্বামীর দোষে ছাড়াছাড়ি হয় তাহলে বিবাহের সময় পাওয়া বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ফেরত দিতে হয়না। স্বামী কোন প্রকার খরচাদিও পায়না। অধিকন্তু স্ত্রীর মানহানির জন্য স্বামীর অর্থ দণ্ড দিতে হয়। ইহাকে বলা হয় 'মান হানি তাঙা'।

(৩) স্ত্রীর দোষে যদি ছাড়াছাড়ি হয়, তাহলে স্ত্রীকে বিবাহের সময় দেওয়া যাবতীয় বস্ত্র ও গহনা পত্রগুলো স্বামী ফেরত পায়। এতদ্ব্যতীত বিবাহের সময় স্বামীর দেওয়া কন্যাপণ বা 'দাবা' ও বিবাহের খরচ সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিকভাবে তালাক প্রাপ্তাস্ত্রীর দিতে হয় এবং ঐ সাথে স্বামীকে মান হানির তাঙাও দিতে হয়।

(৪) স্ত্রীকে অযথা উৎপীড়ন অথবা নিষ্ঠুরভাবে মারধর করলে সেই অত্যাচারীতা স্ত্রীকে স্বামীর স্ত্রীত্ব থেকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধে প্রথম বারের মত স্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিরপত্তার প্রতিশ্রুতিতে অপরাধী স্বামীর নিকট থেকে 'মুছলেকা' নিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর হেফাজতে দেওয়া হতে পারে।

(৫) স্বামী কর্তৃক স্ত্রীসহবাসে অক্ষম প্রমাণিত হলে, সমাজ ছাড়াছাড়ি হওয়ার ব্যাপারে কিছু করতে সমর্থ নহে। যদি স্ত্রী স্বামীকে উপরোক্ত অভিযোগে

প্রমাণাদিসহ ছাড়াছাড়ি অর্থাৎ তালাক নামা দিতে চায় তৎক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া হয়।

(৬) বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা নারীর সহিত যদি অপর বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত পুরুষের গুপ্ত প্রণয় এবং দৈহিক মিলনের অপরাধ প্রমাণিত হয় তৎক্ষেত্রে তাদের উভয়কেই 'ছিনালী' অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ড আর্থিক এবং সামাজিক খানার জন্য নির্দিষ্ট মাপের একটা মর্দা শুকর আদায় করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বড় ছোট মাপের শুকর জরিমানা করা হয়। যেমন- 'তিন মুট্যা, পাঁচ মুট্যা, সাত মুট্যা শুকর ইত্যাদি।

(৭) কারো বাড়িতে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করতে কেহ আনাগোনা শুরু করলে, উহার একটা চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দ্বিতীয় পক্ষ ওই বাড়িতে একই মেয়েকে বৌ দেখতে যাওয়া সামাজিক রীতিমতে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

(৮) কোন পুরুষ বিবাহ করার সময় অন্তত যেন-তেন প্রকারের একটা সামাজিক খানা না দিলে তার সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। সামাজিক খানা না দিলে বিবাহিত কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ কাঁধে বহন করে শ্মশানে নেওয়া নিষিদ্ধ। সামাজিক রীতিমতে তার মৃতদেহ অসম্মানজনকভাবে হাঁটুর নীচে রেখে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

(৯) ভাগ্নে-বৌ, পুত্রবধু, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এবং স্ত্রীর বড় বোনকে স্পর্শ করা সামাজিক রীতিমতে নিষিদ্ধ। এই অপরাধে অভিযুক্ত হলে অপরাধীর জরিমানা হতে পারে, এমনটি অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে তাকে 'পাতের বার' করা হয়ে থাকে।

(১০) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেলে কন্যাকর্তা কোন কারণেই ওই পাত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে অসম্মত কিম্বা অপারগ হলে বরকর্তার আপত্তি ক্রমে সামাজিক বিচারে তাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা এবং বৌ দেখতে যাওয়া আসার সম্পূর্ণ খরচ সহ মানহানির দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

(১১) কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যদি অপর কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের নামে গুপ্ত প্রণয়ের অপবাদ দিয়ে থাকে, সামাজিক রীতিমতে তা প্রমাণ করতে অপারগ

হলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে এবং মানহানির জন্য তাকে জরিমানা করা হয়।

(১২) কুমারী কিম্বা বিধাব স্ত্রীলোকের অবৈধ গর্ভ সঞ্চার হলে, তাকে ব্যভিচার দোষে সামাজিক আদালত (হেডম্যান কিম্বা কারবারীর গৃহে) অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। তখন সে তার অবৈধ গর্ভের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে সামাজিক আদালতে হাজির করে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারলে ছিনালী অপরাধে পুরুষটির সাজা হয়। কিন্তু প্রমাণ করতে না পারলে অবৈধ গর্ভবতীর একাকিনীই দণ্ড এবং পাড়ালিয়াকে মানহানির টাকা দিতে হয়।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা

তঞ্চঙ্গ্যাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা চাকমাদেরই মত। যেমন-

(১) পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সন্তানেরাই উত্তরাধিকার সূত্রে সমান অংশে সম্পত্তির মালিক হয়। (এখানে সম্পত্তি বলতে জরিমানা, গৃহের আসবাবপত্র, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে)। কন্যা সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারে না। তবে পিতার যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে কেবল তৎক্ষেত্রেই কন্যা সন্তানেরা পৈতৃক সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে পারে।

(২) মৃত ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে উহাদের পুত্র সন্তানেরা সমান অংশে সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

(৩) উন্মাদ অথবা সংসার ত্যাগী অথবা পিতার জীবিতাবস্থায় পৃথকান্নভুক্ত সন্তানেরা পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির সমান অংশ পায়।

(৪) মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান না থাকলে যদি তার পালিত পুত্র থাকে; তৎক্ষেত্রে সেই পালিত পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত

হয়। কিন্তু তাকে অবশ্যই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ পোষণ করতে হয়; অন্যথায় মৃত ব্যক্তির বিধাব স্ত্রী সম্পত্তির একাংশ পায়।

(৫) পিতার মৃত্যুর পূর্বে যদি কোন পুত্রের মৃত্যু হয় এবং সেই পুত্রের ঔরসজাত পুত্র সন্তানাদি থাকে তৎক্ষেত্রে পিতামহের মৃত্যুর পর তারা সম্পত্তির অংশ পায় না।

(৬) কোন স্ত্রীলোক যদি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তালাক প্রাপ্ত হয় এবং সেই গর্ভে যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, তবে সেই সন্তান পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে।

(৭) যদি কোন বিধাব অথবা তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের পুত্র সন্তান থাকে এবং সে অবস্থায় যদি সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, সেই পুত্র সন্তানেরা তাদের মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর তত্ত্বাবধানে থাকলেও উহারা মায়ের পূর্ব স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

(৮) অবৈধ সন্তানেরা সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে না। তবে তারা যে ব্যক্তির ঔরসজাত সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর উহার সম্পত্তির অংশ পেতে পারে।

(৯) যদি কোন ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় অথবা বিবাহ করেও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তৎক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অংশ তার জীবিত সহোদর ভ্রাতাগণ সমান অংশে বন্টন করে নিতে পারে।

(১০) যদি কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্পত্তির কোন অংশ অন্য কাহাকেও দানপত্র করে দিয়ে যায় তৎক্ষেত্রে দাতার মৃত্যুর আগে বা পরে দান গ্রহিতা ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হতে পারে।

জন্ম

তঞ্চঙ্গ্যাদের কোন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে একজন 'অসামেলা' কে ডেকে আনা হয়। (তঞ্চঙ্গ্যা মহিলাদের মধ্যে যারা ধাত্রী বিদ্যার কাজ করে

তাদেরকে ‘অসামেলা’ বলা হয়)। যথাসময়ে সন্তান প্রসব হলে, সঙ্গে সঙ্গে শিশুর নাভীমূলে ৫/৬ ইঞ্চি পর্যন্ত রেখে গিটা দিয়ে অপর অংশটা একটা মাটির ঢেলার উপর তুলে একখানা ধারালো বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কেটে দেওয়া হয়। ঐ ধারালো বাঁশের কঞ্চিকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় ‘দলুক’। নাড়ী কাটা হলে গর্ভাশয়ের ফুল একটা ভাঙ্গা মাটির হাঁড়িতে ভরে গৃহের উঠানে পুঁতে রাখা হয়। ঐভাবে পুঁতে রাখার পেছনে তঞ্চঙ্গ্যাদের একটা ধারণা এই যে, যদি উহা দূরবর্তী স্থানে পুঁতে রাখা হয় তাহলে শিশুটি ভবিষ্যতে ভবঘুরে হবে। তাই গৃহের কাছাকাছি থাকার জন্য ঐভাবে গৃহ উঠানে গর্ভাশয়ের ফুল পুঁতে রাখা হয়।

অতপর শিশুকে উষ্ণজলে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়ের শুকনা শয্যায় রাখা হয়।

শিশুর নাভীমূলে ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ঘিলাকসই পানি দিয়ে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতির ছোঁয়া কোন কিছু অন্য লোকেরা স্পর্শ করতে পারে না। যদি স্পর্শ করে তাহলে তারাও অশুচী হিসাবে গণ্য হবে। তাই আলাদাভাবে প্রসূতির ঘরে থালা, বাটি এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি রেখে দেওয়া হয়। প্রসূতিকে যে মেয়ে বা ছেলে ভাত-পানি দিয়ে অথবা যে কোন কাজে সহযোগীতা করে সেই মেয়ে বা ছেলেকেও প্রসূতির সঙ্গে নদী বা ছড়ায় গিয়ে প্রথমে স্নান করে পরে ‘ঘিলাকসই পানি’ দিয়ে শুদ্ধ হতে হয়। (একটা বাটিতে কিছু পানি, কাঁচা হলুদ ৭ চাকা, সোনা অভাবে রূপা এক গাছি, জঙ্গলের এক প্রকার গোল শক্ত ফল যা দিয়ে পাহাড়ী উপজাতি ছেলেমেয়েরা, এমন কি যুবক-যুবতীরা খেলা করে তাকে বলা হয় ‘ঘিলা’, এর শাস ৭ চাকা নিয়ে যে মাঙ্গলীক ক্রিয়াদি করা হয় তাকে বলা হয় ‘ঘিলাকসই পানি’)। উক্ত মাঙ্গলীক পানি দিয়ে প্রসূতি শুদ্ধ শুচী হয়ে ঐ পানি এনে সমগ্র গৃহে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ইহাতে মনে করা হয় যে- অশুচী গৃহখানা শুদ্ধশূচী হয়ে গেল। অতপর অসাবুড়িকে এক দিন গৃহে ডেকে আনা হয় এবং অসাবুড়ি ঘিলাকসই পানি দিয়ে শুদ্ধ হওয়ার পর মোরগ বা মুরগী জবাই করে রেঁধে ভাত খাওয়ানো হয়। ভাতের থালায় ১(এক) টাকা (যাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় ‘নাঈ কাবা তাঙা’ বলা হয়) দিতে হয়। অসাবুড়ি যাওয়ার সময় মদ ২ বোতল মোরগ ১টা দেওয়া হয়। এই মদ ও মোরগ অসাবুড়ি নিতেও পারে, না নিতেও পারে। তবে

ভাতের থালায় যে এক টাকা দেওয়া হয় উহা অবশ্যই দিতে হয় এবং নিতে হয়। উল্লেখ্য যে- বিকালে কসই পানি দেওয়া চলে না।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে শবদাহ বা অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া পদ্ধতি

কোন লোকের মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত ব্যক্তির মুখের ভিতর একটা রৌপ্য মুদ্রা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওই টাকাকে 'মুঅ তাঙা' অর্থাৎ মুখের টাকা বলা হয়। উক্ত টাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তির আত্মা পরপারে অর্থাৎ ভবনদীর অপর পারে পারি দেওয়ার খরচ সঙ্গে দেওয়া। অতপর শবকে স্নান করানো হয় এবং নতুন শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়ে বাঁশ দ্বারা তৈরী পর্যঙ্কের (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'আলং) উপর নতুন শ্বেতবস্ত্র খণ্ড আপাদ মস্তক ঢেকে শয়নাবস্থায় রাখা হয়। আত্মীয় ও হিতৈষী লোকেরা শবের বুকের উপর টাকা পয়সা যার যেমন ইচ্ছা রেখে দিয়ে যায়। ওই টাকা পয়সাকে বলা হয় 'বুগ তাঙা' অর্থাৎ বুকের টাকা।

সাধারণত শবকে গৃহ বারান্দায় ওইভাবে এক বা ততোধিক রাত্রি পর্যন্ত রাখা হয়। বুধবার কিম্বা অমাবস্যার দিন শবকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া রীতি বিরুদ্ধ। যে দিন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন সকালে বাড়ীর উঠানে কাঠের কফিন প্রস্তুত করতঃ শবকে উহাতে স্থাপন করা হয় এবং শবের জন্য ভাত ও মুরগীর বাচ্চা একটা জবাই করে সিদ্ধ করতঃ শবের মুখে কিঞ্চিৎ গুঁজে দিয়ে অবশিষ্টাংশ কলাপাতা দিয়ে 'মোচা' বেঁধে সঙ্গে দেওয়া হয়। এর অর্থ হলো-কোন লোক দীর্ঘ দিনের জন্য দূরে যেতে হলে যেমন বাড়িতে ভাত খেয়ে আর একটা ভাতের মোচা সঙ্গে নিয়ে যায়; তদ্রুপ মৃত ব্যক্তিকেও দেওয়া হয়। শবকে গৃহ থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই শ্মশানে শুকনা কাঠে দিয়ে চিতা প্রস্তুত করে রাখা হয়। চিতা- পুরুষের বেলায় ৫ স্তর এবং স্ত্রীলোকের বেলায় ৭ স্তর করা হয়।

শবকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুরুষ হলে পূর্বমুখী এবং স্ত্রীলোক হলে পশ্চিমমুখী করে চিতায় স্থাপন করা হয়। অতপর ভিক্ষুর নিকট শবযাত্রীরা পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল

সূত্রাদি শ্রবণ করতঃ মৃত ব্যক্তির আত্মায় সৎগতি কামনায় সাধ্যমত টাকা পয়সা ভিক্ষুকে দান করে এবং উহা উৎসর্গ করে দেয়। যথারীতি পূণ্য কর্মাদি করণান্তে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র কিম্বা জনৈক আত্মীয় চিতাকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করতঃ শবের মুখে অগ্নি স্থাপন করে এবং চিতায় অগ্নি সংযোগ করে দেয়। (কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী রোগে আক্রান্ত শবকে দাহ না করে কবর দেওয়া হয়।) দাহকার্য সমাপ্ত হলে শ্মশান হতে ফেরার সময় স্নান অথবা হাত বা মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি প্রক্ষালন করণান্তে শুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করতে হয়।

শবদাহের পরের দিন প্রাতেঃ শ্মশানে গিয়ে স্বগোত্রীয় একজনের দ্বারা শবের ভস্মাবশিষ্টের অস্থির বিভিন্ন অংশ থেকে সামান্য গ্রহণ করতঃ একটা নতুন মাটির হাঁটিতে প্রবিষ্ট করিয়ে নতুন শ্বেতবস্ত্র দ্বারা হাঁড়িটা পেছরের দিকে মাথার উপর দিয়ে ফেলে দেয় এবং ডুবন্ত লোকটি ডান হাত পানির উপরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ডুবন্ত লোকটির কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে সূতা দিয়ে বন্ধন করতঃ টান দিয়ে তুলে নেয়।

তঞ্চঙ্গ্যাদের বিশ্বাস, উক্ত প্রকারে অস্থি নদীতে ফেলে দিলে ওই অস্থি সমুহের কোন অংশ এক সময় না হয় আর এক সময় ভেসে গিয়ে পবিত্র গঙ্গানদীতে পতিত হবে এবং এতে মৃতব্যক্তির সৎগতি হতে পারে।

অস্থি বিসর্জনের পূর্বে অবশ্য অস্থিগুলো নেওয়ার পর শ্মশানের উপরিভাগে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চারকোণ ঘিরে ৭ নাল সাদা সুতা বেড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উপরে চাঁদোয়া খাটিয়ে দেওয়া হয়। বেড়ার মাঝখানে একটু জলপূর্ণ কলসী সাদা কাপড় দ্বারা মুখ বাঁধা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় এবং উহার সহিত বই, কলম, চিরুনী, আয়না, পাংখা, সুগন্ধি দ্রব্যাদিও রেখে দেওয়া হয়। অতপর ৪টি বাঁশের আগায় ৪ খানা লম্বা সাদা বস্ত্রখণ্ড শ্মশানের ৪ কোণায় পুঁতে দেওয়া হয়। এ'গুলোকে বলা হয় 'ট্যাঙোঞ'।

শবদাহের ৬দিন পর সাপ্তাহিক ক্রিয়া করে দেওয়া হয়। উহাকে বলা হয় 'সাত্দিন্যা'। উহাতে যথারীতি ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ ও সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং গৃহীর সাধ্যমত বিবিধ ভোজ্য উপকরণাদি দ্বারা উপস্থিত সকলকে ভোজের তৃপ্তিদানের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। ওই সময়ে

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে টাকা পয়সাসহ বিবিধ গৃহসমাগ্রী ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান করা হয় এবং দানের সময় সকলে উপবেশন করতঃ ধর্মদেশনাদি শ্রবণান্তর দানীয় বস্তুসমূহ উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। অবস্থাপন্ন পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যু হলে দাহ করার পূর্বে সাদেংগ্রী রাজার অনুকরণে গাড়ী টানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে উহার কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। সাদেংগ্রী রাজা শাক্যবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রাতঃস্মরণীয় বলে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রসিদ্ধ।

ভাত দ্যা

প্রাচীনকালে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে 'ভাত-দ্যা' নামে একটা সামাজিক প্রথা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু আমার এই পঞ্চাশোর্ধ বৎসর বয়সেও কোনও কালে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিনি। দিনকাল কতোই যে বদলে যাচ্ছে, আসছে নতুন দিনকাল, তার সাথে সমাজের চেহারাও হচ্ছে বদল। তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি সম্পর্কে ইতোপূর্বে যে সব বিবরণাদি দিয়েছি তার অনেকটাই প্রায় অতীত কালের কথা। কথিত 'ভাত-দ্যা' অনুষ্ঠান ও আগে কালের কথা- আমার এবং আরও অনেকের শোনা কথা।

এই 'ভাত-দ্যা' অনুষ্ঠানে নাকি কেবল আপন গোষ্ঠির তিন বা পাঁচ পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ মৃত ব্যক্তিদের নামের একটা তালিকা পূর্বাহ্নে প্রস্তুত রাখা হতো এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত অসা (বৈদ্য) গণের পরিচালনায় তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটা করে কৃত্রিম শ্মশান তৈরী করা হতো। সাধারণত যতটা শ্মশান তৈরী হতো, তাতে এক একটা 'আদারাড় (ভাতের পৈ) তৈরী করতঃ মৃত ব্যক্তিদের আত্মার উদ্দেশ্যে উক্ত কৃত্রিম শ্মশানে গিয়ে মন্ত্রপাঠ দ্বারা প্রেতাত্মাদেরকে আহ্বান করা হতো। তখন থেকেই না-কি গোষ্ঠির কোন কোন লোক মুর্ছিত হয়ে পড়তো। তখন মৃতদের তালিকা দৃষ্টে পরলোকগত পূর্ব পুরুষগণকে নাম ধরে ডাকা হলে তাতে

মূর্ছিত ব্যক্তির যে পরিচয়ে সংজ্ঞালাভ হতো, সে ব্যক্তিকে তথাকথিত মৃত ব্যক্তির পুনঃজন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা হতো এবং গোষ্ঠির আত্মীয়রা তার আকাঙ্খা পূরণে তৎপর হতো। এভাবে অনেকের সংজ্ঞালাভ করতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। আবার কোন কোন স্থলে রাত্রি শেষ হয়ে যেত। ওই সময়ে না-কি 'আগরতারা' পাঠ করা হতো। পরের দিন ভোরে বিশেষরূপে নির্মিত মঞ্চের উপর উপবেশন পূর্বক অসারা (বৈদ্যগণ) আগরতারা ও মন্ত্রাদি পাঠ করতো। প্রত্যেক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে যেসব স্বতন্ত্র আদারার ব্যবস্থা করা হতো অসাগণ ওই সময়ে সমস্বরে তাতে মন্ত্রপাঠ করতো। এই সময়ে কোন কীট-পতঙ্গাদি আদারায় পতিত হলে মনে করা হতো যে- ওই সব ব্যক্তি তীর্য্যক যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। ওই সময়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। তখন আবার মৃতদের তালিকাভুক্ত লোকদের নামোল্লেখ করে 'তুমি আমার অমুক হলে, এই পিণ্ড গ্রহণ কর' এইরূপে প্রত্যেক আদারা যাচাই করতে করতে হঠাৎ মূর্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হতো এবং সেই যে মৃতজ্ঞাতিস্মর ব্যক্তি পুনঃজন্ম গ্রহণ করেছে, ইহাই স্থির হতো। তখন মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তুমি আমার পিতামহ অথবা অমূক ছিলে এক্ষণে অমূক হয়েছ ইত্যাদি বলে এবং বিবিধ দ্রব্য প্রদান করতঃ তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চলতো।

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

তঞ্চঙ্গ্যারা ধর্মীয় দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও সনাতন প্রথামতে এদের অনেককে গাঙ্পূজা, ভূতপূজা, চুমুলাঙ্ পূজা, মিত্তিনী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কে-পূজা, বুর পাড়া ইত্যাদি কাল্পনীক দেব-দেবীর পূজা করতে দেখা যায়। অবশ্য উপরোক্ত পূজাসমুহ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে করা হয় না। ওইগুলো কেবল কাল্পনীক দেবদেবীর সন্তুষ্টি বিধানকল্পে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। উক্ত পূজাসমুহ সম্পাদনার্থে

সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে তাদেরকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বৈদ্য বা অসা (ওঝা) বলা হয়।

অসা দুই প্রকারের আছে। যথা- মরদ (পুরুষ) অসা ও মেলা (মেয়ে) অসা। মেয়েদের মধ্যে যারা ধাতুবিদ্যার কাজ করে তাদেরকে বলা হয় 'অসা মেলা'।

(১) গাঙ পূজা ঃ ইহাকে গাঙ (গঙ্গা) পূজাও বলা হয়ে থাকে। কোন লোক রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকলে এবং কোন প্রকার চিকিৎসা অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগে কার্যকরী ফল দেখা না গেলে তৎক্ষেত্রে বৈদ্য বা অসাগণ তান্ত্রীক পদ্ধতিতে গণনা করতঃ স্থির করে যে, উক্ত রোগীকে গঙায় পেয়েছে কিনা অর্থাৎ ওই রোগীর প্রতি গঙা দেবীর কু-নজর পতিত হয়েছে কিনা। যদি পরীক্ষায় স্থির হয় যে, ওই লোকটির প্রতি গঙার কু-নজর পতিত হয়েছে তৎক্ষেত্রে বৈদ্য বা অসাগণ জলের ঘাটে গিয়ে তান্ত্রীক পদ্ধতিতে রোগীর নামে গঙা দেবীর উদ্দেশ্যে মোরগ, মুরগী, হাঁস, কবুতর, ছাগল ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটি বলি দিয়ে দেয়।

(২) **ভুতপূজা** ঃ সাধারণত পাহাড়ীদের ধারণা ছিল যে, ভুত গাছে বাসা করে থাকে। কোন লোক অথবা গৃহ পালিত পশু হারানো গেলে অথবা কোন লোকের মস্তিষ্ক বিকার জনিত কারণে আবোল তাবোল বক্‌তে থাকলে মনে করা হয় যে, ঐ লোকটিকে ভুতে পেয়েছে। সুতরাং ভুতের সন্তুষ্টি সাধনকল্পে বৈদ্য বা অসাগণ যে কোন একটা বৃহৎ বৃক্ষগোড়ায় গিয়ে তান্ত্রীক পদ্ধতিতে ভুতের উদ্দেশ্যে মোরগ, শুকর ইত্যাদি বলি দিয়ে দেয়।

(৩) চুমুলাঙ্ পূজা ঃ এই পূজা গৃহস্থের পারিবারিক মঙ্গলের জন্য অথবা গ্রহদোষ নিবারণার্থে করা হয়ে থাকে। ইহা বিবাহ রূপ ধর্মীয় বন্ধনের পরিশুদ্ধিতার উদ্দেশ্যে ও অতি করণীয় বলে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে স্বীকৃত। অন্যথায় বিবাহ অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিবাহের পর চুমুলাঙ্ পূজা না করলে বিবাহিতা স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন অধিকার থাকে না বলেও বলা হয়ে থাকে। এই পূজায় মোরগ, মুরগী, শুকর ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তৎসঙ্গে মদ অবশ্যই থাকতে হবে। এই মদ যেখান থেকে হোক যোগাড় করে আনলে হবে না। এই মদ যে উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় সে উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না।

এই মদকে অতিশয় পবিত্র বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সাধারণত চুমুলাঙ্‌ পূজাকে গৃহ দেবতার পূজা বলে গণ্য করা হয়।

(৪) মিত্তিনি পূজা ঃ তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় মিত্তিনী অর্থ মৃত্তিকা বা ধরণীকে বুঝায়। এই পূজা বিশেষত নবান্নের সময় ঘটা করে সম্পাদিত হয়। ইহাতে গৃহস্থের মৃহ পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করে পিণ্ডদান করা হয়। উদ্দেশ্য তাদের আত্মার শান্তি কামনা করা যাতে তাদের সন্তুষ্টিতে গৃহস্থের সার্বিক মঙ্গল সাধন হয় এবং প্রতিবছর জুমের ফসলাদি অধিক হয়ে গৃহস্থের সুখ ও সমৃদ্ধি হয়।

(৫) লক্ষ্মী পূজা ঃ আদিম কালে প্রায় তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবারে গৃহকত্রিরা মুরগীর সিদ্ধ ডিম অথবা আগে ডিম দেয়নি এমন বয়সের মুরগী (মোরগের নহে) বধ করে নাড়িভুঁড়ি ফেলে দিয়ে গোটা সিদ্ধ করতঃ পৈদাঙে সাজিয়ে গৃহের মধ্যবর্তী কোন এক কোণায় পূজা দিয়ে থাকে। লক্ষ্মীদেবীর জন্ম নাজি বৃহস্পতিবারে। তাই এই দিনে তাঁর পূজা দেওয়া হয়। লক্ষ্মীদেবীকে ঐশ্বর্য্য দেবী বলেও মনে করা হয়।

(৬) কে পূজা ঃ ইহা গঙ্গা ও মৃত্তিকা পূজা। সাধারণত দেশে খরা দেখা দিলে এক বা একাধিক পাড়া বা গ্রামের একই সমাজভুক্ত লোকদের নিয়ে বড় রকমের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থ হতে চাঁদা উঠিয়ে শুকর, ছাগল, হাঁস, মোরগ, কবুতর, এমনকি মহিষ খরিদ করে নদী বা ছড়ার তীরবর্তীস্থানে গিয়ে এই পূজা করা হয়ে থাকে। পূজারীদের মনে ধারণা এই যে, এই পূজা করলে বৃষ্টি হয়ে মাটি খুব উর্বর হবে এবং জুমের ফসলাদি অধিক বৃদ্ধি পাবে।

(৭) বুরপারা ঃ যদি কোন লোক হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, তৎক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির গোষ্ঠির মধ্যে যত লোক জীবিত আছে, উহাদের সকলের উপস্থিতিতে গোষ্ঠির সাত পুরুষ পর্যন্ত যত লোক আগে মারা গিয়েছে সাত পুরুষের নামের তালিকা পাওয়া না গেলে চার পুরুষ কিম্বা তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের নামের তালিকা প্রস্তুত করতঃ তাদের নাম উল্লেখ করে পিণ্ডদান করা হয়। পূজায় ছাগল, মোরগ, মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত যে কোন পূজাদিতে ‘মদ’ অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় পূজা হতে পারবে না। তবে ভুতের পূজায় মদের প্রয়োজন হয় না।

উপরোক্ত পূজাসমুহ ব্যতীত তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে আরও কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে যেমন- ছেলেদের ‘ধুতী পৈ’, মেয়েদের ‘কানফোড়া পৈ’ ও ‘খাদি পৈ’ ইত্যাদি।

তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় ‘পৈ’ শব্দের অর্থ হলো মেলা বা উৎসব। এই সমস্ত পৈ কিন্তু সকলের জন্য অবশ্য করণীয় নহে। এইগুলো এক প্রকার ‘মানস’ করার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়ে থাকে। যেমন- কোন স্বামী-স্ত্রী মানস করে যে পুত্র সন্তান হলে ছেলেকে ‘ধুতি পৈ’ করাবেন। অতপর যদি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তাহলে উক্ত ধুতি পৈ করে না দেওয়া পর্যন্ত ছেলে ধুতি পরিধান করতে পারবে না।

মেয়েদের ‘কান ফোড়া পৈ, খাদি বা বক্ষ বন্ধনী পৈ’ও উক্তরূপ মানসের কারণে করা হয়ে থাকে। উপরোক্ত পৈ এর মাধ্যমে ছেলে বা মেয়েদেরকে বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে আশীর্বাদ নিতে দেওয়া হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বুদ্ধপূজা ব্যতীত ও সলাঘর, চ্যাপঘর, ব্যূহচক্র চংক্রমণ, জাদি পৈ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। তবে এইগুলো বর্তমান যুগে প্রায় নজরে পড়ে না। পূর্বকালে এইসব উৎসবাদিতে বড় বড় মেলা হতো এবং প্রায় যুবক-যুবতীরা অংশ গ্রহণ করতো। কোন পাড়া বা গ্রামে ঐরূপ মেলার আয়োজন হলে নির্ধারিত তারিখের পূর্ব রাত্রে যুবক-যুবতীরা তথায় গিয়ে হাজির হতো আর হাত ধরাধরি কিম্বা যুবকেরা যুবতীদেরকে জড়িয়ে ধরে সারা রাত উবাগীত গেয়ে নৃত্য করতঃ চ্যাপঘর কিম্বা জাদি অথবা বোধিবৃক্ষের চারপাশে চংক্রমণ করতো। ঐ সময়ে যে কোন যুবক অন্য যে কোন যুবতীকে জোর পূর্বক চংক্রমণ স্থানে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে নৃত্য করতে পারতো, তাতে যুবতীর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে অপর লোকেরা বাধা দিতে পারে না।

বাদ্যযন্ত্র

তঞ্চঙ্গ্যাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাঁশি, বেলা, খেংখ্যং ও ঢুঢুক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(১) বাঁশি ঃ ছয় ছিদ্রযুক্ত একটি বাঁশের ছোট নলির মাঝখানে মৌমাছির মোমদ্বারা আটকানো একটি যন্ত্র বিশেষ। তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা নিজেরাই এই বাঁশি তৈরী করে নেয়। এর স্বর ও সুর অতি মধুর। তঞ্চঙ্গ্যা যুবকেরা উবাগীতের সুরে যখন এই বাঁশি বাজায় তখন শ্রোতাদের মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়ে যায়।

(২) বেলা ঃ বেহালাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'বেলা' বলা হয়। তঞ্চঙ্গ্যা গেংগুলিরা ইহা বাজিয়ে সারা রাত 'রাধামন-ধনপুদি' পালাগীত গেয়ে শ্রোতাদের মনে প্রচুর আনন্দ সঞ্চার করে থাকে। এই যন্ত্র মাদার গাছ দিয়ে তৈরী করা হয় এবং অবিকল বেহালার মতই গঠন প্রণালী।

(৩) খেংখ্যং ঃ মিতিঙ্গা বাঁশের ছোট কঞ্চি দিয়ে ইহা তৈরী করা হয়। কঞ্চির মাঝখানে একটা সরু জিহ্বার মতো রাখা হয়। একপ্রান্তে ছোট দড়ি কিম্বা সূতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তঞ্চঙ্গ্যা যুবতীরা এই যন্ত্র ঠোঁটের দু'ফাঁকে স্থাপন করতঃ দড়ি বা সূতাকে ঈষৎ টেনে টেনে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে সুর তোলে।

(৪) ঢুঢুক ঃ ইহা এক জাতীয় ঢোল। একটি মোটা শক্ত বাঁশের দু'দিকের দু'পর্বা রেখে, মাঝখানে লম্বালম্বী একটা ছিদ্র রাখা হয়। ইহার বাদক বাম বগলের নিচে একাংশ রেখে অন্যহাত দিয়ে একটি শক্ত ভারী বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আঘাত করে করে তাল বাজায়।

সংগীত ঃ অধিকাংশ উপজাতীয় সংগীত বলতে নৃত্যগীতকেই বুঝায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সে ধরনের নৃত্যগীত এক প্রকার নেই বললেই চলে। গেংগুলিরা যে গীত গেয়ে থাকে, তাকে কোন প্রকারেই সংগীত নামের আখ্যা দেওয়া চলে না। গেংগুলিরা কেবলমাত্র একটা বেহালাকে সম্বল করে এককভাবে সারা রাত উবাগীতের সুরে গেয়ে থাকে; সে গীত 'রাধামন-ধনপুদি' পালা বিষয়ক। ওই গীতের মধ্যে তেমন কলা-কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্ণনামূলক রাধামন-ধনপুদির পালাগীতে গেংগুলিরা একাই দ্বৈত অথবা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যায়

মাত্র। তবুও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে গেংগুলিদের আদর খুব কম নহে। ধানহ্যাত অর্থাৎ লক্ষ্মীপূজা, মিত্তিনীপূজা, নবান্ন চুমুলাঙ্ অর্থাৎ গৃহ দেবতার পূজা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যু হলে তাঁদের সাপ্তাহিক ক্রিয়া ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এইসব গেংগুলিদেরকে বেশ মোটা অংকের টাকা বায়না দিয়ে আনয়ন করা হয়। সন্ধ্যার অল্প পরেই খাওয়া দাওয়া সমাপ্ত করে গেংগুলিরা ঘরের বারান্দায় অথবা মাচাংঘরের 'ইচর'-এ পাটির উপর বসে। মাঝখানে বসে গেংগুলি বেহালা হাতে গীত গায়।

গেংগুলির সম্মুখে একটা থালায় করে পাঁচ পোয়া চাউল, একটা টাকা এবং এক গ্লাস মদ দেওয়া হয়। চতুর্দিকে আগ্রহী শ্রোতারা গীত শোনার জন্য ভীড় করে এবং সময় সময় ঈহু-হু-হু-হু ধ্বনিতে রেইং দেয়। সাধারণত গেংগুলিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই এইভাবে রেইং দেওয়া হয়ে থাকে। এই রেইং উদ্দীপনা সূচক। কেউ কেউ এই সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীও তর্জনীকে একত্রে মুখে পুরে এক প্রকার শিস দেয় যাকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় বলা হয় 'খ্যাংশিক'। গেংগুলিদের এই সব গীতের মধ্যে রাধামন-ধনপুদির জন্ম, শৈশব, যৌবনকাল সম্পর্কে বিশদ বিবরণ থাকে। লোকমুখে শুনেছি এই রাধামন-ধনপুদির কাহিনী সম্পূর্ণ গাইতে হলে নাকি গেংগুলিদের বেশ কয়েক রাত কেটে যায়। সংক্ষিপ্তভাবে এই কাহিনীর সারমর্ম বলতে মাত্র কয়েক মিনিটে বলে শেষ করা যায়। অথচ গেংগুলিরা একটা কথা বলতে গিয়ে অনেক কথার অবতারণা করে সারারাত সারাদিন ধরে শ্রোতাদের মনে আনন্দ দিতে থাকে।

রাধামন-ধনপুদির পালাগীতে 'চাদিগাঙ্ছাড়া' অংশে রাজা বিজকগ্রীর অক্সাদেশ তথা রোয়াঙ্গ অভিযান ও রাধামনের প্রধান সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধযাত্রা রাধামনের বীরত্ব ও অক্সাদেশ জয় ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়।

এই যাবত তঞ্চঙ্গ্যাদের যে সব গেংগুলির নাম পাওয়া গেছে, তারা হলেন- বংশী গেংগুলি, দুম্‌প্রু গেংগুলি, পংচান গেংগুলি, মাসিঅং গেংগুলি, রুসীঅং গেংগুলি, মেন্দ গেংগুলি, ভাগ্য কুমার গেংগুলি, বিচকধন গেংগুলি, গবাচান গেংগুলি ও কক্কিলা গেংগুলি প্রমুখ।

গেংগুলি গীত ব্যতীত তঞ্চঙ্গ্যা যুবক-যুবতীরা যে গীত গেয়ে থাকে তা ‘লাঙ্যা-লাঙনী গীত’ অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার গীত নামে পরিচিত। এছাড়া বারমাসীও গাওয়া হয়ে থাকে।

একটি লাঙ্যা-লাঙনী গীত

মরদ ঃ ঠেঙা মারাত রাঙী ক;
ও বোঞ- কাএ লুবে তুই ভাঙি ক।
পুড়ি পুইনায় গম ভারত-
তধুক্যা লা-বা ন দেগং এই সংসারত।
দাউয়ান বারি ফিটকিরি-
ম-এ লুবেনে ক ঠিক্‌গুরি।

মেলা ঃ দোয় মারাত ঘি-তুত্যে-
ওদা; - মধুক্যা মেলা তুই কি গুত্যে?
উয়্যা বাচ্যোয়া সাসাংগে-
কাম করত ন জানং বিলি
গিরিত্যি ধুইবার লাসাংগে।

মরদ ঃ ছুলি ছুলি পৈ সাচং-
চিরা ন গুইত্য ও বোঞ মুই আগং।

মেলা ঃ মক্যা বিচি ঝরাঙ্গে-
ও দা; মনুষ্য কলঙ্গী ডরাঙ্গে।

মরদ ঃ মৈশ গত্তনাত খং কলং-
ত-লৈ মুই গম দিন চেই ফং উবং।

মেলা ঃ কাক্যা লামে বড় চরত

মরম া বাবে ন-দিলে
কিংগুই বৌ এরুং মুই তর ঘরত?

মরদ ঃ কুশ্যাল কাবি পাচ্ পাব খেইঞ্
ত-এ ন পেলে মুই আক্যাব যেইঞ্।
বেসোঞ্ বুনি চা-বা জু-
কন্ কাত্যি ঘাসিলে ও বোঞ্ লা-বা মু।
ভু-রে বানি বিরিদ্যি-
ও বোঞ্- কমলে ধুত্যে তুই গিরিত্যি?
পবাঙ লুরি বেলা তার-
গিরিত্যি ধুইবার সময় যার।
উই যারন কু-আ পাল্-
দিন দিন পুই যার বুআ-কাল।
ছাগ আগা কর্মীব-
বুআ কালত আড়ুপিয়া, কাঙাল পিয়া জরমীব।
বাজার বেনায় কচ্খেলে-
মা বাব ঘর বচ্ গেলে।
উএর সারাল্যা দআ লামে-
কমলে খেবং পআ কামে?
বারি গুগুচ্যা পক্ত ওল্-
গিরিত্যি ধুইবার অক্ত ওল।
দিন যার, বছর যার, বচ্ যার,
কার যার? আমার যার।
ভুরে বানি তিরিদ্যি।
আন্দাজে বুছঙর ও বোঞ্-
ধুত্যে নয় মএলৈ তুই গিরিত্যি।
সুবায় কিনদে গণ গুণ্যত্য-
খুস ধান্নুন কএ খেলে
কিংগুই বৌ যেবে মএ ফেলে?

পারা কাবি তিন তারা-
যদি বৌ যাচ ভিন্ পাড়া;
থাদারী দগানত থাল কিনিত্য
উড়িলে মনত মএ নাং ঘিনিত্য।

চাকমারা শাক্য বংশীয়

চাকমা নামের উৎপত্তি কখন এবং কি প্রকারে হলো তার বিশদ বিবরণ এযাবত সঠিকভাবে জানা যায়নি। কোনও জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেলে সে জাতির অতীত কাহিনী বা উহার ইতিবৃত্ত অবশ্যই জানা দরকার। কিন্তু চাকমা জাতি সম্পর্কে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন, ফলে বিষয়টা এতোই গোলমেলে আকার ধারণ করেছে যে, চাকমা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া কষ্টকর।

'আরণ্যক জনপদে' স্বনাম ধন্য মাননীয় আবদুস সাত্তার মহোদয় 'চাকমা জাতি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য এক স্থানে উল্লেখ করেছেন যে- "মগদের মতে চাকমারা মুগলদের বংশধর। .... কোনও এক সময়ে মুগলরা আরাকান রাজের হাতে পরাজয় বরণ করেন। ফলে বহু মুগল সৈন্য বন্দী দশায় আরাকানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আরাকান রাজ তাদেরকে স্বদেশের মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবার আদেশ দিয়ে আরাকানেই অন্তরীন করে রাখেন। ঐসব মুঘল সৈন্যের ঔরসে এবং আরাকানী নারীদের গর্ভে যে জাতির উদ্ভব হয়েছিল তারাই সাক্ বা সেক্ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। জে. পি. মিলস-ও একই মত পোষন করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, চাকমারা মগ নারী ও মুগল সৈন্যদের সমন্বয় জাত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকেই মুঘলধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তথাকার চাকমা প্রধানরাও মুসলমানী নাম ধারণ করেন। অতপর সেখানে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ফলে তারা হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট

হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয় এবং হিন্দুধর্ম অন্তর্হিত হয়। ক্যাপ্টেন হাবার্ট লুইন্ রে মন্তব্যেও এই উক্তির সমর্থন মিলে।

তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, চাকমারা মুঘল বংশধর না হলেও এককালে এরা মুসলমান ছিল। কালের বিবর্তনে হয়ত ধর্মীয় ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। এই মন্তব্যের সমর্থনে সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রতিপন্ন করেছেন যে, ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জামাল খাঁ, সের মস্ত খাঁ, দৌলত খাঁ, সের জান বক্স খাঁ, জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরম বক্স খাঁ, প্রভৃতি চাকমা ভূপতিগণ খাঁ উপাধি পরিগ্রহ করতেন। তদানুষাঙ্গিক ইহাও উল্লেখিত হতে পারে যে ঐ সময়ে তাঁদের কুল বধুগণেরও 'বিবি' খেতাব প্রচলিত ছিল।' (আরণ্য জনপদে। ৮ পৃঃ)

এখন প্রশ্ন হলো 'সাক' বা 'সেক্' থেকে যদি চাকমা নামের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে চাকমা জাতির ইতিকথা কি কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল? আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে যে সাদেংগ্রী রাজার পূর্ব পুরুষরা একদা হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত তৎকালীন কলাপনগর নামক রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন এবং সাদেংগ্রী রাজার অনুকরণে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের শবদাহ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার হুবহু মিল রয়েছে এতে কেমন করে বিশ্বাস করা চলে যে, চাকমারা মুঘল বংশধর অথবা তথাকথিত সাক্ বা সেক্ জাতির বংশধর?

সাদেংগ্রী নিঃসন্দেহে একজন শাক্যবংশীয় নরপতি ছিলেন এবং চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত থেকে ও আমরা জানতে পারি যে, উক্ত সাদেংগ্রী রাজার সহিত বর্তমান চাকমা রাজবংশের একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র রয়েছে।

আমরা বৌদ্ধশাস্ত্রেও দেখতে পাই যে- শাক্যজাতি প্রধানত ৩টা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন- মহাশাক্য, লিচ্ছবি শাক্য ও পার্বত্য শাক্য। তথাগত ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং পার্বত্য শাক্য ছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালে শাক্য জাতির হিমালয় পর্বতের পাদদেশে এবং উহার পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমুহে বসবাস করতেন পরবর্তীকালে তাঁদের কিছু অংশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

এ ক্ষেত্রে রাজা চম্পাসুর, সেনাপতি কালাবাঘা ও রাজা বিজকগ্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাক্মাদের এককালের প্রাচীন নগরী 'চম্পক নগর' বর্তমানে সিলেট

ও গারোহিল বলে জানা যায়। এই সব পার্বত্য এলাকার গারোদের মধ্যেও অনেকে নামের শেষে 'চাংমা' লিখে থাকেন এবং তাঁদের সাথে চাকমাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এককালের বিশিষ্ট নেতা স্বর্গীয় কামিনী মোহন দেওয়ান তাঁর 'পার্বত্য চট্টলের একজন দীন সেবকের কাহিনী' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে 'চাকমা শব্দের উচ্চারণটা প্রকৃতপক্ষে চাংমারই বিকৃতধ্বনি মাত্র। এখনও অনেক লোক আছেন, যাঁরা চাকমা বলতে 'চাংমা' কিম্বা চাম্মা বলে থাকেন। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা সম্প্রদায় একদা 'মগ' নামে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তাঁরা নামের শেষে 'মারমা' লিখেন। চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায় এককালে বড়গোয়া' নামে অভিহিত হতেন, তাঁরাও বর্তমানে নামের শেষে বড়ুয়া লিখছেন। অনুরূপ চাকমাদেরই অপর এক অংশ তঞ্চঙ্গ্যাদের বেলায়ও উল্লেখ্য যে- তঞ্চঙ্গ্যারা ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ মেঙ্গদি কর্তৃক 'দৈংনাক' আখ্যা পেয়েছিলেন। অতপর ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে চট্টগ্রামের আলীকদম নামক স্থানে তৈন ছড়ী পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান কালে 'তৈন-তং-য়্যা' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। বর্তমানে এরাই নামের শেষে তঞ্চঙ্গ্যা লিখছেন। সুতরাং চাকমারাও শাক্য হতে শাকমা কিম্বা চম্পক নগরে বসবাস করতেন বলে পরবর্তীকালে চাকমা নামে পরিচিতি লাভ করেছেন এতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি?

ভাষা

ভাষা ও উচ্চারণে চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে যে পার্থক্যটা রয়েছে এখানে উহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। লক্ষণীয় যে,

১. চাকমা ভাষায় যৎস্থলে 'দ' উচ্চারিত হয়, অধিকাংশ তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় তৎস্থলে 'র' উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন-
   চাকমা ভাষায় যেখানে বলা হয় - কুদু যত্তে? (কোথায় যাচ্ছ?)

তঞ্চঙ্গ্যাদের ধন্যাগছা ভাষায় সেখানে বলা হয় - কুরু যত্তে?

কারর্বা গছা ভাষায় অবশ্য বলা হয় - কুদি যত্তে?

কিন্তু মো গছা ভাষায় বলা হয় - কুরি যত্তে?

২. চাকমা ভাষায় যৎস্থলে 'র' হয়, তঞ্চঙ্গ্যাদের তৎস্থলে 'য়' বা 'এ' হয়। যেমন-
চাকমা ভাষায় যেখানে বলা হয় 'মরে' অর্থাৎ আমাকে। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় সেখানে বলা হয় 'ম-এ' বা 'মে'।

৩. চাকমা ভাষায় যৎস্থলে 'জ' হয়; তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় তৎস্থলে 'স' বা 'শ' হয়। যেমন-
চাকমা ভাষায় যেখানে বলা হয় 'হ্াজি গিয়ে' অর্থাৎ হারানো গেছে; তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সেখানে বলা হয় 'হ্াশি গিয়ে'।

৪. চাকমা ভাষায় যেখানে 'ন' বা 'ম' হয়; তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় সেখানে 'ঞ' হয়। যেমন-
চাকমা ভাষায় 'বোন' অর্থাৎ ভগ্নি। তৎস্থলে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'বোঞ্' হয়।
চাকমা ভাষায় 'যেম' অর্থ যাবো। তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'যেঞ্' হয়।

তঞ্চঙ্গ্যারা বিশেষ করে যারা পাহাড়ের গায়ে জুম করে জীবিকা নির্বাহ করে, তারা জাতীয় ভাষারূপে চাকমা ভাষাতেই পড়ালেখা করে থাকে। পরস্পরের মধ্যে চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান, বারমাসী, তালিকা (ঔষধের তালিকা) ইত্যাদি ক্ষেত্রে চাকমা বর্ণমালায় এবং চাকমা ভাষায় লিখিত হয়। চাকমা বর্ণমালায় মোট ২৭টি বর্ণ বা চিহ্ন আছে এবং এইগুলো অনেকটা মগী (মাগধী) বর্ণমালার অনুরূপ।

তঞ্চঙ্গ্যাদের গণনা

এক্	১	সাদাচ্	২৭	তিপ্পান্ন	৫৩	উনাশি	৭৯
দ্বি	২	আদাচ্	২৮	সুপ্পান্ন	৫৪	আশি	৮০
তিন্	৩	উনত্রিচ্	২৯	পাচ্পান্ন	৫৫	একাশি	৮১
চায়্	৪	ত্রিচ্	৩০	ছাপ্পান্ন	৫৬	বিরাশি	৮২
পাচ্	৫	এগত্রিচ্	৩১	সাতান্ন	৫৭	তিরাশি	৮৩
ছোয়্	৬	বত্রিচ্	৩২	আটান্ন	৫৮	সুরাশি	৮৪
সাত্	৭	তেত্রিচ্	৩৩	উনষাচ্	৫৯	পাচাশি	৮৫
আত্ত্য	৮	সুত্রিচ্	৩৪	ষাচ্	৬০	ছিয়াশি	৮৬
নয়	৯	পাত্রিচ্	৩৫	একষত্য	৬১	সাতাশি	৮৭
দচ্	১০	ছত্রিচ্	৩৬	বাষত্য	৬২	আটাশি	৮৮
এগার	১১	সাত্রিচ্	৩৭	তেষত্য	৬৩	উনানব্বই	৮৯
বার	১২	আত্রিচ্	৩৮	সুষত্য	৬৪	নব্বই	৯০
তের	১৩	উন চল্লিচ্	৩৯	পাষত্য	৬৫	একানব্বই	৯১
চোদ্দ্য	১৪	চল্লিচ্	৪০	সষত্য	৬৬	বিরানব্বই	৯২
পনর	১৫	এক চল্লিচ্	৪১	সাত্ষত্য	৬৭	তিরানব্বই	৯৩
ষুল	১৬	বেয়াল্লিচ্	৪২	আট্ষত্য	৬৮	চুরানব্বই	৯৪
সতর	১৭	তেতাল্লিচ্	৪৩	উনসত্তর	৬৯	পাচানব্বই	৯৫
আদার	১৮	সুচল্লিচ্	৪৪	সত্তর	৭০	ছিয়ানব্বই	৯৬
উনচ্	১৯	পাচল্লিচ্	৪৫	এগাত্তর	৭১	সাতানব্বই	৯৭
কুড়ি	২০	ছচল্লিচ্	৪৬	বাহাত্তর	৭২	আটানব্বই	৯৮
এগোচ্	২১	সাত্ চল্লিচ্	৪৭	তিয়াত্তর	৭৩	নিরানব্বই	৯৯
বাইচ্	২২	আট চল্লিচ্	৪৮	চুয়াত্তর	৭৪	একশত	১০০
তেইচ্	২৩	উনপঞ্চাচ্	৪৯	পাচাত্তর	৭৫	এক হাজার	১০০০
চুব্বিত	২৪	পঞ্চাচ্	৫০	ছিয়াত্তর	৭৬	এক লাখ	১০০০০০
পসোচ্	২৫	একান্ন	৫১	সাদাত্তর	৭৭	এক কু'ড়ি	১০০০০০০০
ছাব্বিত	২৬	বাআন্ন	৫২	আদাত্তর	৭৮	বা এক কু'দি	

বা-না

ধাঁ-ধাঁকে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় 'বা-না' বলা হয়। বা-নার প্রকৃত অর্থ বন্ধন। তঞ্চঙ্গ্যা ছেলে-মেয়েরা একজন অপরকে বা-না দেয় অর্থাৎ ধাঁ-ধাঁর প্রশ্ন করে, অপর ছেলে বা মেয়ে বা-না ভাঙায় অর্থাৎ ধাঁ-ধাঁর বন্ধন ভঙ্গ করে ধাঁধাঁর বন্ধন ভেঙ্গে দেয়। নিম্নে ঐরূপ কতিপয় 'বা-না' ও উত্তর দেওয়া গেল। যেমন-

(১) 'চাল্ আগে তলা নাই' অর্থাৎ চাল বা ছাউনী আছে, কিন্তু তলা বা ভিত নাই। উত্তর ঃ ছাড়ি অর্থাৎ ছাতা।

(২) 'এক দাজ্যা বুজ্যাত্তুন একশত দাঁত' অর্থাৎ এক দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধের একশতটি দাঁত আছে। উত্তর ঃ মক্যা অর্থাৎ মকাই বা ভুট্টা।

(৩) 'গাইছ আগাত পানি খআ' অর্থাৎ গাছের আগায় পানির কুয়া। উত্তর ঃ ডাব নাইকুল অর্থাৎ ডাব।

(৪) 'তলা আগে ছাউনী নাই' অর্থাৎ তলা বা ভিত আছে, কিন্তু ছাউনী নাই। উত্তর ঃ দোলোঞ্ অর্থাৎ শিশুর দোলনা।

(৫) 'পাঁচ ভাই তুরে ছাব্বিশ ভাই ঘিরে' অর্থাৎ পাঁচ ভাই তুলে আর ছাব্বিশ ভাই মিলে ঘিরে। উত্তর ঃ পাঁচ আঙ্গুল ও ছাব্বিশটি দাঁত।

(৬) 'ধুল্যে ধআ যায়, ঢেলে দেগা ন পায়' অর্থাৎ ধরলে ধরা যায়, কিন্তু চাহিলে দেখা না পায়। উত্তরঃ কান অর্থাৎ নিজের কান।

(৭) 'গাঙকুএ বাঙাল ঘর, আড়ুকুবি ছালাম গঅ' অর্থাৎ গাঙের কুলে বাঙ্গালীর গৃহ বা ঘর, হাঁটু গেড়ে ছালাম কর। উত্তরঃ কাঙা গাত্ (গর্ত থেকে কাঁকড়া বেড় করা।)

(৮) 'ধুল্যে এক মুট, মিল্যে প্যাংজগা' অর্থাৎ ধরলে একমুষ্টি কিন্তু মেলে দিলে মাঠ ভরে। উত্তর ঃ জাল।

(৯) 'চাল আগাত ব-মুগ, যে ভাঙে ন পাএ তে ব শুগ' অর্থাৎ চালের আগায় বড় মুদ্গার, যে ভাঙতে পারে না সে বড় শুকর। উত্তর ঃ লো গুলা অর্থাৎ চালকদু।

তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে যাঁদের নাম স্মরণযোগ্য তাঁরা হলেন ঃ

১। **কুন্দ মহাজন** ঃ ইনি এককালে বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

২। **পমলাধন তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ ইনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে 'ধর্মধ্বজ জাতক' নামে একটা কাব্য গ্রন্থ রচনা করে পার্বত্য বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ সাহিত্য রচনার প্রথম সূত্রপাঠ করেন।

৩। **শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো** ঃ গৃহীনাম ফুলনাথ তঞ্চঙ্গ্যা। চাকমা রাজগুরু নামেই ইনি সবিশেষ পরিচিত। ইনি চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রবক্তা। তাঁর প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে 'রাউলী' সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'শ্রামণ-কর্তব্য, সমবায় বুদ্ধোপাসনা, পরিণাম, অনাগত বংশ, চাকমা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ- আগরতারা, বৌদ্ধ ধর্মের স্বরূপ, বিজ্ঞান ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁর অমর অবদান।

৪। **শ্রী কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ ইনি 'বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা, উদয়ন বস্তু, গৃহী বিনয়, বৌদ্ধ গল্পমালা, কুলধর্ম, বোধি পালঙ্ক প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি গৌতম বুদ্ধের অতীত জাতক কাহিনী অবলম্বনে 'মানুষ দেবতা' নামে তিন অঙ্কের একখানা নাটক রচনা করেন। যাহা রাজস্থলী বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়।

৫। **শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ ইনি 'অমিতাভ, রক্তের কলঙ্ক' এ দুটো নাটক এবং 'চাকমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান ও বৌদ্ধধর্ম', সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় দর্শন, লোকায়ত দর্শন, উত্তরণ, চাকমা সমাজে বোধিসত্ত্বের সাধনা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, পূণ্যতীর্ণ চিৎমরম ও বোধিসত্ত্বের সাধনা, প্রভৃতি আরও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। মুলত ইনি তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের একজন সার্থক প্রবন্ধকার বললে অত্যুক্তি হয় না।

৬। **শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ সম্ভবত ইনি ও বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যাই তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সর্বপ্রথম ম্যাট্রিকুলেট। ইনি তঞ্চঙ্গ্যা সমাজের সর্বপ্রথম বি.এ. পাশ এবং জেলা কানুনগো।

৭। **শ্রী যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে প্রথম এল.এল.বি এবং ই.পি.সি.এস। বর্তমানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

৮। **শ্রী জ্ঞান বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ ইনি তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম.এ পাশ করেন।

৯। **শ্রীমান রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ সে অঙ্কন শিল্পী হিসাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

১০। **শ্রী উচ্চমনি তঞ্চঙ্গ্যা** ঃ ইনি আলীকদম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং সাধারণ সম্পাদক। 'পাহাড়িকা গুঞ্জন' নামক সাহিত্য ম্যাগাজিনের প্রকাশক।

বর্তমানে অনেক তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত আছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তঞ্চঙ্গ্যারা আরও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হবে।

লেখক পরিচিত

(বংশলতা)

১। অং।

২। তাঁর পুত্র রুই চান।

৩। তাঁর পুত্র বিগল চান। স্ত্রী তিরাবী।

৪। তাঁর পুত্র কুন্দ মহাজন। স্ত্রী চাইলামে। তাঁদের পাঁচপুত্র, যথা- রসিক চন্দ্র, জুরচান, শিকল চান, রসিক নাগর ও গুণমনি।

৫। তাঁর পুত্র রসিক নাগর। স্ত্রী সুরমালা। তাঁদের চারপুত্র, যথা- ১. অশ্বিনী কুমার (স্ত্রী-জুবাচোখী), ২. ললিত চন্দ্র (স্ত্রী-শপুরী), ৩. যোগেশচন্দ্র (লেখক) ও ৪. উমেশ চন্দ্র (স্ত্রী-আদর্শ মালা)।

৬। তাঁর পুত্র যোগেশ চন্দ্র। স্ত্রী মেত্তমালা। তাঁদের পুত্রকন্যাগণ হলেন যথাক্রমে- নিহার বালা, সুব্রত কুমার, প্রীতিকনা, স্মৃতিকণা, গীতি রাণী ও দিতি রাণী।

লেখকের কথা

আমি পিতার তৃতীয় সন্তান। জন্ম ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৩৬ বাংলা। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাদ্বয় অতি অল্প বয়সে বিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বাল্যকালে আমি অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম এবং সম্ভবত তাই বলে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু স্নেহময়ী মা ও কাকা গুণমণি মহাজনের সীমাহীন করুণা পেয়েছিলাম। কাকা বাবুর কৃপায় ১৯৪৭ ইংরেজীতে রাঙ্গুনীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই। পরবর্তী বছর ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে আমার অগ্রজ ললিত চন্দ্র ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে চন্দ্রঘোনা মিশনারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

আমার বড় দাদা অশ্বিনী কুমারের মৃত্যু তারও আগে হয়েছিল। সুতরাং আমি পড়াশুনা বিসর্জন দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। অতপর কুতুবদিয়া জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় (সাময়িক) এর প্রধান শিক্ষক বাবু সুধীর রঞ্জন বড়ুয়ার নিকট প্রাইভেট ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করি। ১৯৫৩ ইং আমাদের গ্রামের কুতুবদিয়া উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু হরিমোহন বড়ুয়া রাঙ্গামাটি পিটিসি তে চলে গেলে তাঁর স্থলে আমি অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করার সুযোগ পাই। ১৯৫৪ ইং হরিমোহন বড়ুয়া পিটিসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে আমি পিটিসি তে যাই এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র পাই। ১৯৬০ ইংরাজীতে কাপ্তাই বাঁধের দরুন উদ্বাস্তু হয়ে বান্দরবান এর ৩৩৭নং বালাঘাটা মৌজায় সস্ত্রীক পুনর্বসতি নিই। জঙ্গলা জমি আবাদাদি করতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৬/১২/৬৫ইং রোয়াংছড়ি থানাধীন হাংঠুকরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করি। ১৯৭১ ইং বান্দরবান থানাধীন চেমী ডলুপাড়া মাদ্রাসা কেন্দ্র থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। বর্তমানে আমি বান্দরবান উপজেলাধীন আমতলী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি।

বিবাহিত জীবনে আমি কোনদিন সুখী হতে পারিনি। তবে ইহাই আমার একমাত্র কর্মফল মনে করে নীরবে বাকী জীবন অতিবাহিত করছি।

আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো বই পড়া। বান্দরবান থেকে প্রকাশিত মাসিক 'ঝর্ণা' পত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু। উক্ত প্রথম কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম ঃ-

ঝর্ণা ঃ

খোল তব দ্বার
তোল চাঁদ মুখ
গাও সুমধুর গান।
হে পার্ব্বত্য রমণী
তব জীবনের বাণী-

কভু নাহি হোক ম্লান।
সত্যের সন্ধানে
অমৃতের পানে
শুরু হোক তব অভিযান।
প্রেম তব ধীরে ধীরে
সুরে সুরে তোল ভরে
ভাষার ঝঙ্কারে,
রূপে রসে হও আগুয়ান।
সুরগুলি তব
নিত্য নব নব উঠুক বাজিয়া;
তাহারি ছন্দে
দোদুল আনন্দে নাচুক সবার হিয়া।

এতদ্ব্যতীত ঝরণা পত্রিকায় আমার আরও কতিপয় কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ঝরণা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে রাঙ্গামাটি থেকে মাসিক 'পার্বত্য বাণী' প্রকাশিত হয়। 'পার্বত্য বাণীতে' সবচেয়ে যে কবিতাটি আমার সার্থক বলে মনে হয়েছিল তা হলো 'অবিস্মরণীয়া'। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

অবিস্মরণীয়া

নীরব নিথর নিশা;
আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ হাসে মনোহরা
বিরহী মনেতে জাগে কামনার তৃষা।
শুভ্র জ্যোৎস্নাস্নাত সাজিয়াছে ধরা
অপরূপ; বিধাতার সর্বোত্তম গড়া।
মনে পড়ে এমনি এক মায়াবিনী রাতে

আধো হাসি আধো লাজে;
প্রথম প্রণয়ের ফুল ডালি হাতে
দাঁড়ালে আমার আগে মোহণীয়া সাজে
আবেগে নিয়েছি টেনে মোর বক্ষ মাঝে।
বসন্তের শুক্লাতিথির চাঁদেরে ঘিরিয়া
সরসী সহসা মদির স্বপনে হলো যেন মগ্ন
মৃণাল বাসরে মরাল-মরালী বুকে বুক নিয়া
প্রিয়া সাথে প্রিয় কি মধুর সে শুভ লগ্ন।
সেদিন তোমার অধরে অধর রেখে
বলেছিনু; তুমি মোর কবিতা, আমি তব কবি,
প্রণয়ের স্মৃতিপটে আল্পনা মেখে
রচিব কাব্য তব, মনোরম ছবি,
রহিবে অক্ষত যতদিন নভেঃ উদিবে শশী-রবি।
এমন সময়ে মৃদুল মলয়ে কামরাঙ্গাবন
থরো থরো উঠিল হঠাৎ যেন কাঁপিয়া।
দুরু দুরু বুকে সুধাইনু তোমারে তখন
বলো প্রিয়া আমায় যাবে নাতো কভু ভুলিয়া?
উত্তরে জানালে শুধু সম্বিতে চাহিয়া।
ভাবিনি তখন প্রিয়াপাখী মোর
সহসা যাবে উড়ে রাখি মোরে একাকী,
হাজারো কাজের ফাঁকে ফেলি আঁখি মোর,
প্রিয়ার সে ছবিখানি শুধু চলিয়াছি আঁকি
যাপিতেছি দিবানিশি প্রিয়া প্রিয়া ডাকি।
এই মধুমাস, এই মধুরাতি মিছে বহে যায়-
প্রিয়া কাছে নাই, নাই নাই নাই নীরব বাসর বাতি,
প্রেয়সী নিশার স্মৃতিপটখানি হলো মোর চিরসাথী।